ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইসলামী খেলাফত
ও
নেতৃত্ব নির্বাচন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-২১
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الخلافة الإسلامية وطريق انتخاب الإمارة

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ : মার্চ ২০০৩ খৃ.

২য় সংস্করণ
মুহাররম ১৪৪৩ হি./ভাদ্র ১৪২৮ বাং/আগস্ট ২০২১ খৃ.
৩য় প্রকাশ
রবীউল আউয়াল ১৪৪৩ হি./কার্তিক ১৪২৮ বাং/অক্টোবর ২০২১ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

ISLAMI KHILAFAT O NETRITTO NIRBACHAN (Islami Khilafat & the way to select leadership). 2nd Edn. 2021 A.D. by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport Road, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861, 88-01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. hadeethfoundationbd.com

সূচীপত্র

(المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের নিবেদন	০৬
প্রথম ভাগ	
ইসলামী খেলাফত	০৯
নবুঅত পরবর্তী অবস্থা	১৩
খেলাফত ব্যবস্থা ও অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার চেতনাগত পার্থক্য	১৯
ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা	২০
ইসলামী খেলাফতের সার্বজনীনতা	২৫
ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা	২৭
রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফত	৩০
খেলাফত হ'তে মুলূকিয়াত (?)	৩৩
আলী-মু'আবিয়া (রাঃ) দ্বন্দ্বের প্রকৃতি	৩৬
ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার কারণ	৩৬
ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	৪০
কামালের অপকীর্তি সমূহ	৪৪
ফিলিস্তীন ট্রাজেডী	৪৭
রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফতের মধ্যকার পার্থক্য	৪৯
'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার উপায়	৫২
সংশয় নিরসন	৫৬
মুমিনের করণীয়	৫৭
দ্বিতীয় ভাগ	
নেতৃত্ব নির্বাচন	৫৯
নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা সমূহ	৬১
বর্তমান পৃথিবীতে নির্বাচন সমূহ ; (১) আমেরিকার নির্বাচন	৬২
(২) চীনের নির্বাচন	৬৩

সূচীপত্র

(৩) যুক্তরাজ্যের সরকার ব্যবস্থা ৬৫
(৪) জাপানের সরকার ব্যবস্থা ৬৬
(৫) ফ্রান্সের নির্বাচন; (৬) রাশিয়ার নির্বাচন ৬৭
(৭) সুইজারল্যাণ্ডের নির্বাচন ৬৮
নির্বাচন সমূহ পর্যালোচনা ৬৯
ইসলামী নির্বাচন নীতি ৭০
নেতৃত্বের গুরুত্ব ৭১
শ্রেষ্ঠ নেতা ও তার পুরস্কার ৭৩
নেতৃত্বের গুণাবলী ৭৬
নেতৃত্ব নির্বাচন ফরযে কেফায়াহ ৮৪
নির্বাচক কে হবেন? ৮৪
খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন ৮৫
অছিয়ত বিহীন অবস্থায় নির্বাচন ৯০
নেতৃত্ব বাছাই ও নির্বাচকের যোগ্যতা ৯১
ইমারত ও বায়‘আত ৯৪
জামা‘আতে খাছ্ছাহ বা সংগঠন ৯৫
জামা‘আতে ‘আম্মাহ বা রাষ্ট্রীয় খেলাফত ৯৭
জামা‘আতবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতা ৯৯
বায়‘আত ও আনুগত্যের স্বরূপ ১০০
বায়‘আতের উদ্দেশ্য ১০৩
বায়‘আতের গুরুত্ব ১০৩
বারবার বায়‘আত করা ১০৪
বিভিন্ন প্রকার বায়‘আত ১০৫
ইমারত ও বায়‘আত পর্যালোচনা ১০৬
বায়‘আতের ফলাফল ১০৯
আনুগত্যের গুরুত্ব ১১৪
জাহেলী হালতে মৃত্যু-র ব্যাখ্যা ১১৮

জাহেলিয়াতের সংগঠন হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক ১১৯
খালেছ ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কর্তব্য ১২১
বায়'আতের পদ্ধতি ১২৩
নির্বাচন পদ্ধতি সমূহ পর্যালোচনা ১২৪
গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলাম ১২৫
গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যক্তিগত কুফল ১২৬
গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সামাজিক কুফল ১২৭
শূরার গুরুত্ব ১৩০
বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব? ১৩৩
বর্তমান সময়ে দেশের আমীর নির্বাচন ১৩৫
আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৩৬
আনুগত্যের পরিধি ১৩৮
প্রেসিডেন্ট ও আমীরের মধ্যে পার্থক্য ১৪৩
আমীরকে বাধ্য করা যাবেনা ১৪৩
শূরা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৪৫
বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৪৭
বিচারক তিন প্রকার ১৪৮
ন্যায়বিচারকদের মর্যাদা ১৪৯
কাযী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার ১৫০
আমীরের অব্যাহতি; আমীরের উত্তরাধিকারী ১৫২
আমীর ও জনগণ ; দায়িত্বশীলতার কিছু নমুনা ১৫৩
ইসলামী নির্বাচনের ফলাফল ১৫৫
জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম ১৫৬
উপসংহার ১৫৯
ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন : এক নযরে ১৬০
জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব সমূহ ১৬১

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের নিবেদন (كلمة المؤلف)

১৯০৯ সালে ইহূদী নেতারা ৩৪তম ওছমানীয় খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের (১৮৭৬-১৯০৯ খৃ.) নিকট বহুমূল্য উপঢৌকনের বিনিময়েও যখন ফিলিস্তীন তাদের অধিকারে নিতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া বস্তুবাদী মতাদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে তরুণ শ্রেণী ও দুর্বলচেতা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে। সেনাবাহিনীর মধ্যে গ্রুপিং করে। তখন থেকেই খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন শুরু হয়ে যায়। যার প্রতিবাদে ভারতে মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৯) ও তার ছোট ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর (১৮৭৮-১৯৩১)-এর নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে 'খেলাফত আন্দোলন' (১৯১৯-১৯২৪ খৃ.) গড়ে ওঠে।[১] ঐ সময় এমনকি মি. গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সহ হিন্দু নেতারাও বৃটিশ বিরোধিতার স্বার্থে 'খেলাফত আন্দোলন'-কে সমর্থন করেন।

অবশেষে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মুছতফা কামালের হাতে ৩৭তম ও সর্বশেষ খলীফা ২য় আব্দুল মজীদ (১৯২২-

১. ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আহূত লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বলেন, 'আমি শুধু একটি উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। তা এই যে, আমি মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চাই আযাদীর পরওয়ানা হাতে নিয়ে। কোনো পরাধীন ভূখণ্ডে আমি ফিরে যাব না'। পরে ১৯৩১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী লণ্ডনেই তাঁর মৃত্যু হয়। লণ্ডনের ভক্তরা তাঁকে সেখানেই দাফন করতে চান। অন্যদিকে ভারতের ভক্তদের দাবী ছিল তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তাঁর জন্য অবশেষে বরাদ্দ হ'ল পবিত্র ভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 'কুব্বাতুছ ছাখরা'র নিকটবর্তী স্থান। যে বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখলের জন্য ইহূদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীরা ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংস করেছিল। ইতিপূর্বে তার মা কারা ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে দুই সন্তানকে বলেছিলেন, আমি পরাধীন সন্তানদের নয়, স্বাধীন সন্তানদের বুকে নিতে চাই'। লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে থাকা অবস্থায় মাওলানা মুহাম্মাদ আলী একদিন সেখানকার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীতে গিয়ে সমস্ত তাকের উপরে রক্ষিত একটি বইকে লক্ষ্য করে সেটা পড়তে চাইলেন। তখন লাইব্রেরীয়ান তাকে বলেন, আপনিতো মুসলমান। আর ওটাতো আপনার ঘরের কিতাব, আল-কুরআন। মুহাম্মাদ আলী বললেন, এটার জন্য আপনাদের এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন কেন? জবাবে লাইব্রেরীয়ান বলেন, This is the Fountainhead of all sciences. এটি হ'ল সকল বিজ্ঞানের উৎসমূল' *(ঐ, জীবনী)*।

১৯২৪)-এর পতনের মাধ্যমে ৬৬২ বছরের ঐতিহ্যবাহী ওছমানীয় খেলাফত (৬৮০-১৩৪২ হি./১২৮১-১৯২৪ খৃ.) বিলুপ্ত হয়। এর ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য শেষ হয়ে যায়।

নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা ও পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং ইহূদী-খৃষ্টানদের চক্রান্তই ছিল খেলাফত বিলুপ্তির কারণ। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ একই রোগে আক্রান্ত। একই চক্রান্তের শিকার হয়ে তারা আজ ইসলামী খেলাফতের স্বপ্ন ছেড়ে কুফরী রাষ্ট্র কায়েমে জান-মাল উৎসর্গ করছে। ফলে স্লাইস্‌ড পাউরুটির ন্যায় টুকরা টুকরা হওয়া ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র কার্যতঃ অমুসলিমদের গোলামী করছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব না হ'লেও পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে যদি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহ'লে সেটিই হবে বিশ্ব মানবতার জন্য সত্যিকারের আদর্শ রাষ্ট্র। এই স্বপ্ন নিয়েই আগামী দিনের তরুণদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মানুষের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্‌র দাসত্বে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ কবুল করলে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশেও সেটি সম্ভব হ'তে পারে।

জানা আবশ্যক যে, ইসলাম যেমন সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ইসলামী খেলাফত তেমনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত। আর এজন্য মুসলিমরাই হবেন অগ্রসৈনিক।

বাংলাদেশ ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশ। ইসলামের বিধান মতেই এদেশ চলবে এটাই কাম্য। এর কল্যাণ স্পর্শে দেশ নবজীবন লাভ করবে এবং সর্বদা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে থাকবে। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দৃঢ়চিত্ত আল্লাহভীরু একজন 'খলীফা' বা 'আমীর' নির্বাচন করা। যিনি আল্লাহ্‌র বিধান মতে দেশ পরিচালনা করবেন।

হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের অছিয়ত করছি আল্লাহভীরুতার এবং আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্য করার। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সে অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা সেগুলি আঁকড়ে ধরবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা অবশ্যই নবোদ্ভূত বস্তু সমূহ হ'তে বিরত থাকবে। কেননা ইসলামে সকল প্রকার নবোদ্ভূত বস্তু

বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’। ‘আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[২] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ’ল দিবসের ন্যায়। আমার পরে যে ব্যক্তি উক্ত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে, সে ধ্বংস হবে’।[৩] উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের আলোকে অত্র বইয়ে ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচনের বিধি-বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

মাসিক আত-তাহরীক মার্চ ২০০০, ৩/৬ সংখ্যায় ‘ইসলামী খেলাফত’ এবং মে ২০০০, ৩/৮ সংখ্যায় ‘নেতৃত্ব নির্বাচন’ শিরোনামে ‘দরসে কুরআন’ কলামে নিবন্ধ দু’টি প্রকাশিত হয়। অতঃপর দু’টি নিবন্ধ একত্রিত করে ‘ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন’ নামে মার্চ ২০০৩-য়ে বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় (পৃ. ৪৮)। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে বইটির পুনঃপ্রকাশ দেরী হয়। বর্তমানে বইটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে *ইনশাআল্লাহ*।

পরিশেষে অত্র বইটি প্রকাশে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত

২৬শে এপ্রিল ২০২১ সোমবার। *-লেখক।*

১৪৪২ হিজরী।

---

২. عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– وفى رِوايةٍ للنسائِىِّ : وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ– আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; আহমাদ হা/১৭১৮৪; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৬৫ ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৩. ...قَالَ : قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ... ইবনু মাজাহ হা/৪৩, রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ); আহমাদ হা/১৭১৮২; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম ভাগ (الجزء الأول)

ইসলামী খেলাফত (الخلافة الإسلامية)

الْحَمْدُ لِلّهِ الذّي أرْسلَ رُسُلَه بالبينات والْهُدَى، وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ- قال الله تعالى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا- يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلاً- فَأَمَرَ اللهُ المؤمنين بطاعة الأمير بشرط طاعته القرانَ وسنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم-

وَسُمِّيَتْ بالخلافةِ الإسلاميةِ لِأَنَّ الخليفةَ يَخْلُفُ الخلفاءَ الراشدين المهديين بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِتَوَلِّى المسلمين والدَّولةَ الإسلامية- فإن غايةَ الخلافة هى تطبيقُ أحكامِ الإسلامِ وتنفيذُها فى البلاد وحملُ رسالتهِ صلى الله عليه وسلم إلى العالَم بالدعوة والجهاد. وعلى المسلم أن يُّحْيِىَ الخلافةَ الإسلاميةَ لإعلاءِ كلمةِ الله فى الآفاق. لأن الله تعالى قال : وَلَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً- (النساء ١٤١)- فالسَّعىُ منا والإتمامُ من الله، وصلى الله على نبينا محمد وآلِهِ وصَحبه وسلم-

‘খেলাফত’ (اَلْخِلاَفَةُ) অর্থ প্রতিনিধিত্ব। পারিভাষিক অর্থে ‘ইসলামী খেলাফত’ হ’ল, আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী শাসন ব্যবস্থার নাম। যা রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের রেখে যাওয়া শাসন নীতির প্রতিনিধিত্ব করে’। এর লক্ষ্য হ’ল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনা করা ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর উদ্দেশ্য হ’ল, খেলাফতের সর্বত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

বস্তুতঃ ইসলামী খেলাফতের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা সর্বাবস্থায় পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী থাকেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, দুনিয়ায় তার ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা এবং আখেরাতে তার চিরস্থায়ী জান্নাত। আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ- وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- (النور ٥٥-٥٦)-

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রদান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভীতির বদলে নিরাপত্তা দান করবেন। এজন্য তারা কেবল আমারই দাসত্ব করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অবাধ্য হবে তারা হবে পাপাচারী’। ‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*।

শানে নুযূল : রবী‘ বিন আনাস আবুল ‘আ-লিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ মক্কায় দশ বছর দাওয়াতী কাজে

অতিবাহিত করেন। এ সময় তারা সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকতেন। তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর অনুমতি পেয়ে তারা মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু এখানেও তাদেরকে সর্বদা অস্ত্র সাথে নিয়ে দিবারাত্রি অতিবাহিত করতে হ'ত এবং সর্বদা জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির ভয় ও আতংকের মধ্যে থাকতে হ'ত। একদিন জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কতদিন এভাবে আতংকের মধ্যে থাকব? এমন দিন কি আসবে না যেদিন আমরা নিরাপদ হব ও অস্ত্র ত্যাগ করব? তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যেখানে তাদেরকে আরব-আজমের উপরে খেলাফত প্রদানের নিশ্চিত ওয়াদা প্রদান করা হয়। যেমন ইতিপূর্বে খেলাফত দান করা হয়েছিল হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-কে বিশাল জনপদের উপর এবং বনু ইস্রাঈলকে মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চলের উপর। এভাবে সর্বত্র ভীতির বদলে নিরাপত্তা এবং অস্থিতির বদলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মুসলমানগণ পৃথিবীর চালকের আসনে সমাসীন হয় *(তাফসীর ইবনু কাছীর, মাযহারী)*।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ অত্র আয়াতে মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে ওয়াদা দিয়েছেন। যেখানে শেষের দু'টিকে প্রথমটির ফলাফল বলা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করা (২) ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) ভীতির বদলে নিরাপত্তা দান করা।

আল্লাহ্র এই ওয়াদা খেলাফতে রাশেদাহ্র ত্রিশ বছরের শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মক্কা, খায়বর, বাহরায়েন, হাযরামাউত, ইয়ামন ও সমগ্র আরব উপত্যকা বিজিত হয়। এমনকি হিজরের অগ্নি উপাসক ও দক্ষিণ সিরিয়ার মুতা সহ কতিপয় খ্রিষ্টান এলাকা থেকে তিনি জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুক্বাউক্বিস, ওমানের শাসকবর্গ ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী প্রমুখ তৎকালীন পৃথিবীর সেরা রাজন্যবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন *(ইবনু কাছীর)*। তাঁর ওফাতের পর ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। ইরাকের বছরা ও সিরিয়ার দামেস্ক নগরী তাঁর আমলেই

বিজিত হয়। অন্যান্য দেশেরও কিছু কিছু এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়। আবুবকর (রাঃ)-এর মাত্র দু'বছরের খেলাফত (১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খৃ.) শেষে পরবর্তী খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেন যে, নবীগণের পর এমন সুন্দর ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা পৃথিবী আর কখনো দেখেনি। ওমর (রাঃ)-এর দশ বছরের খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খৃ.) সিরিয়া ও ইরাক পুরোপুরি বিজিত হয়। সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ তাঁর করতলগত হয়। তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম সম্রাট 'ক্বায়ছার' ও পারস্য সম্রাট 'কিসরা'-র সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন ও মিসরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন বা রোমান সাম্রাজ্য পূর্ণভাবে মুসলমানদের অধীনস্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আলজেরিয়া, ফিলিস্তীন, আর্মেনিয়া, সাইলিসিয়া এবং আফ্রিকার বার্কা, ত্রিপোলী প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামী খেলাফত বিস্তৃত হয়।

ওমর (রাঃ)-এর পরে ওছমান (রাঃ) খলীফা হন। তাঁর ১২ বছরের খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) ইসলামী খেলাফতের সীমানা আরও প্রসারিত হয়। মুসলিম সেনাবাহিনী একদিকে যেমন কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, হিরাত, কাবুল, গযনী প্রভৃতি এলাকা দখল করে। অন্যদিকে তেমনি আর্মেনিয়া, ত্বাবারিস্তান ও তিফলিশ অধিকার করে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর এবং উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পদানত করে। এ সময় নবগঠিত নৌবাহিনীর সাহায্যে সাইপ্রাস দ্বীপ বিজিত হয়। ফলে তখন ইসলামী খেলাফত কেবল প্রাচ্যে নয় বরং পাশ্চাত্যেও প্রসার লাভ করে। আলী (রাঃ)-এর ছয় বছরের খেলাফতকাল (৩৫-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খৃ.) প্রধানতঃ গৃহযুদ্ধেই অতিবাহিত হয়। তবে খেলাফতের শাসন ও আয়তন অক্ষুণ্ণ থাকে।

অতঃপর উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওছমানীয় খেলাফত কালে বলা চলে যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপের স্পেন ও বলকান অঞ্চলের কিছু অংশে ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। যা ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তুরস্কের শেষ খলীফা সুলতান ২য় আব্দুল মজীদ-এর পতনের ফলে বিলুপ্ত হয়। ইসলামের চিরশত্রু ইহূদী-নাছারাদের চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র,

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ছুরি দিয়ে তাদের দোসর মুসলিম নেতাদের হাতেই তুরস্কের খেলাফত ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। সেদিন থেকে ইতিমধ্যে প্রায় একশ' বছর গত হয়েছে। অথচ এখনও মুসলমান জেগে ওঠেনি। বরং আজও তারা একই ধোঁকাবাজির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। কারণ রাষ্ট্রীয় জীবনে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' প্রথমে মানুষকে ইসলামের বন্ধন হ'তে মুক্ত করে। অতঃপর 'গণতন্ত্র' তাকে মানুষের গোলামীতে আবদ্ধ করে। অতঃপর 'জাতীয়তাবাদ' তাকে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলে বিভক্ত করে। অতঃপর 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' এই শয়তানী নীতি তাকে স্থায়ীভাবে শোষণ ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবে পরিণত করে। সেখান থেকে বের হবার কোন পথ সে খুঁজে পায়না। কেবলমাত্র ইসলামী খেলাফত তাকে শৃংখলমুক্ত করে এবং আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের যথার্থতার অন্যতম দলীল। আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদাহ্র স্বর্ণযুগে নবুঅতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ৫৭টি রাষ্ট্রে মুসলমানদের শাসন কায়েম রয়েছে। যদিও ইসলামী আইন ও শাসন বলতে গেলে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নেই।

আয়াতটি কেবলমাত্র খেলাফতে রাশেদাহ বা ছাহাবায়ে কেরামের যামানার জন্য খাছ নয়। বরং পৃথিবীর সর্বত্র বা যেকোন প্রান্তে মুসলমানগণ এই শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করতে পারে।

নবুঅত পরবর্তী অবস্থা

(الحالة بعد النبوة)

নবুঅত প্রাপ্তিকালে মক্কায় ছিল গোত্রশাসিত সমাজ ব্যবস্থা। সেখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান সমূহ গোত্রপ্রধানদের ইচ্ছা মত রচিত হ'ত। তারা আল্লাহকে স্বীকার করলেও এবং কা'বাগৃহের সেবক হ'লেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনীত বিধান মানতে অস্বীকার করে। ফলে মুসলিমদের উপর নেমে আসে লোমহর্ষক নির্যাতন সমূহ। যেমন-

(১) মক্কায় ৬ষ্ঠ মুসলিম হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) বলেন,

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَهْوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَّهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا؟ قَالَ : فَقَعَدَ وَهْوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ– وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ–

‘একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বার ছায়ায় চাদর মাথার নীচে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় আমরা গিয়ে তাঁর নিকটে কাফেরদের নির্যাতনের অভিযোগ পেশ করলাম এবং বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করবেন না? তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্বেকার মুমিনদের মাথায় করাত রেখে জীবন্ত চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, তবুও তাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের হাড্ডি পর্যন্ত সমস্ত গোশত ও শিরা-চামড়া উঠিয়ে ফেলা হয়েছে, তবুও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় এই (ইসলামী) শাসন পূর্ণতা লাভ করবে। এমনকি ইয়ামনের ছান‘আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একজন আরোহী একাকী ভ্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া সে কাউকে ভয় পাবে না। কেবল তার ছাগপালের উপর নেকড়ের হামলার ভয় ব্যতীত। কিন্তু তোমরা বড়ই ব্যস্ততা প্রদর্শন করছ’।[৪] উল্লেখ্য যে, খাব্বাব ৬ষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। মক্কার

৪. বুখারী হা/৩৬১২, ৩৮৫২; আবুদাঊদ হা/২৬৪৯; মিশকাত হা/৫৮৫৮ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ-১।

মুশরিক নেতারা তার উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। তারা তাকে জ্বলন্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়েছিল। ফলে পিঠের চামড়া ও গোশত গলে লোহার আগুন নিভে গিয়েছিল *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৪৫ পৃ.)*।

(২) হিজরতের পর মদীনায় এসেও সেখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা কাছাকাছি একই রূপ ছিল। সমাজ ও ধর্মনেতারা যা বলতেন, জনগণ সেটাকেই 'দ্বীন' ভেবে নিত। জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর পুত্র 'আদী বিন হাতেম তৎকালীন সময়ে খৃষ্টানদের নেতা ও যবরদস্ত আলেম ছিলেন। স্বীয় ভগ্নি ও সম্প্রদায়ের লোকদের উৎসাহে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলেন, তখন তাঁর গলায় স্বর্ণ খচিত[৫] ক্রুশ (†) চিহ্ন ঝুলন্ত ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন মজীদের সূরা তওবা ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

اِتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَآ أُمِرُوآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوآ إِلَهًا وَّاحِدًا، لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- التوبة -٣١

'ইহূদী-নাছারাগণ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের আলেম ও দরবেশগণকে ও ঈসা ইবনে মারিয়ামকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এদের এইসব শিরক হ'তে সম্পূর্ণ পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াত শুনে 'আদী বিন হাতেম বলে উঠেন, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি না'। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ 'আল্লাহ যা

৫. কোন কোন বর্ণনায় এসেছে রৌপ্য খচিত *(ইবনু কাছীর)*।

হালাল করেছেন, তারা কি তাকে হারাম করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম গণ্য করেছ। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা কি তাকে হালাল করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল গণ্য করেছ। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ- 'তাহ'লে ওটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَابًا- وقال الضحاك : أى سادةً لهم مِن دُون الله، 'ইহূদী-নাছারাদের ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ পাক ঐসব আলেম ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'। যাহ্হাক বলেন, অর্থাৎ 'তাদের সমাজনেতাগণ'।[৭] বর্তমান যুগের ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের অবস্থা এর চাইতে ব্যতিক্রম কিছুই নয়।

(৩) হযরত 'আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় একজন এসে তার অভাবের কথা জানালো।

---

৬. পুরা বর্ণনাটি নিম্নরূপ- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ عُنُقِىْ صُلَيْبٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِىُّ إِطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ قَالَ : فَطَرَحْتُهُ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اِتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ) قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ : أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ : فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ- رواه ابن جرير فى تفسيره واللفظ لحديث ابى كُرَيْبٍ- দ্র. তাফসীর ইবনু জারীর ত্বাবারী (বৈরূত : ১৯৮৬ খৃ.) ১০/৮০-৮১ পৃ.; ঐ, হা/১৬৬৩২ ১৪/২১০ পৃ.; তিরমিযী হা/৩০৯৫ 'তাফসীরুল কুরআন' অধ্যায়-৪৪, 'সূরা তওবাহ' অনুচ্ছেদ-১০, হাদীছ 'হাসান'।

৭. তাফসীর ইবনু জারীর ত্বাবারী (বৈরূত : ১৯৮৬ খৃ.), ১০/৮০-৮১ পৃ.; ঐ, হা/১৬৬৪১, ১৬৬৩০।

অন্যজন এসে রাহযানীর অভিযোগ করল। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ‘আদী! তুমি কি (ইরাকের) ‘হীরা’ নগরী চেন? আমি বললাম, না। তবে নাম শুনেছি। তিনি বললেন,

فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِى غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. قَالَ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ فَهَذِهِ الظَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِى غَيْرِ جِوَارٍ وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ– قَدْ قَالَهَا–

‘যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর এই শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, (ইরাকের) হীরা (নগরী) থেকে একজন গৃহবধূ একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে ও বায়তুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে। আর কিসরা বিন হুরমুযের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে এবং তা এত বেশী পরিমাণে বিতরণ করা হবে যে, অবশেষে তা নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ‘আদী বলেন, হীরা থেকে নিঃসঙ্গ কুলবধূকে একাকী এসে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করতে দেখেছি। কিসরা বিন হুরমুযের সিংহাসন ও ধনভাণ্ডার বিজয়ে আমি নিজে শরীক ছিলাম। এক্ষণে যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, তৃতীয়টি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটার কথা বলেছেন (অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিজয় লাভ করবে)।[৮]

---

৮. আহমাদ হা/১৮২৮৬; বুখারী হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৫৮৫৭ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ-১।

(৪) হযরত ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِيْ مَا زَوَى لِيْ مِنْهَا- 'আল্লাহ আমাকে সমগ্র পৃথিবী একত্রিত করে দেখালেন। অতঃপর আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। সত্বর আমার উম্মতের শাসন অতদূর পর্যন্ত পৌঁছানো হবে, যতদূর পর্যন্ত এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে'।[৯]

(৫) হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) এরশাদ করেন, بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالدِّينِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ،... فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيبٌ- 'তুমি এই উম্মতকে সুসংবাদ দাও এই পৃথিবীতে তাদের গৌরব, উচ্চ মর্যাদা, দ্বীনের নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার।... অতঃপর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য আখেরাতের কাজ করবে, তার জন্য আখেরাতের কোনই অংশ থাকবেনা'।[১০]

এতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে কেবল দুনিয়া পায় আখেরাত হারায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারায় *(হজ্জ ২২/১১)*। কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে, সে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই পায় *(শূরা ৪২/২০)*।

(৬) হযরত মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا، (قُلْتُ : فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ)- 'ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না, সম্মানীর ঘরে সম্মানের

---

৯. মুসলিম হা/২৮৮৯ 'ফিতান' অধ্যায়-৫২, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/৫৭৫০।
১০. আহমাদ হা/২১২৫৮; হাকেম ৪/৩৪৬, হা/৭৮৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২৩।

সাথে অথবা অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। এক্ষণে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। আমি বললাম, তাহ'লে তো গোটা দ্বীন আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে' (অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করবে)।[১১]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে দেখা যায় যে, মক্কায় ও মদীনায় উভয় স্থানে রাসূল (ছাঃ) বিশ্বব্যাপী ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয় এবং ভবিষ্যতেও এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে। অতঃপর ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর সারা বিশ্বে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে *(আবুদাঊদ হা/৪২৮২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫৪৫২ ও অন্যান্য)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আমরা এখন সেই যুগ অতিবাহিত করছি, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূর ৫৫ আয়াত)*।

খেলাফত ব্যবস্থা ও অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার চেতনাগত পার্থক্য

(الفرق بين شعور الخلافة الإسلامية والحكومات الأخرى)

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনেক সময় মুসলমান তার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনে স্বাধীন থাকলেও বৈষয়িক জীবনে সে অনৈসলামী আইনে শাসিত হয়। সেখানে আখেরাত নয়, কেবল দুনিয়া মুখ্য হয়। ফলে এই রাষ্ট্রের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এমনকি সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাদলের মধ্যেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রেরণা থাকেনা। দুনিয়াবী সব কিছু পাওয়ার পর তারা আর কিসের জন্য জীবন দিবে? পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতের নেতা-কর্মীগণ ও সেনাবাহিনী আখেরাতের স্বার্থে কাজ করে এবং সব কাজে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী থাকে। আর এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ব্যভিচারের আসামী মা'এয আসলামী ও গামেদী মহিলা নিজেরা এসে

১১. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; আনফাল ৮/৩৪; মিশকাত হা/৪২ 'ঈমান' অধ্যায়-১; ছহীহাহ হা/৩।

মৃত্যুদণ্ড চেয়ে নেয়।[১২] মদ্যপায়ীর মত অপরাধীরা নিজেরা এসে অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি চেয়ে নেয়, পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬১৫, ১৮)*। এইভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহভীরুতা হয় খেলাফতের অধীনস্ত নাগরিকদের মূল চালিকাশক্তি। এখানে নেতৃত্ব নিয়ে কোন ঝগড়া নেই। কারণ ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ এবং এটিকে ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় আমানতের জওয়াবদিহিতার বিষয় হিসাবে কঠিনভাবে ভয় করা হয়। কেননা ক্বিয়ামতের দিন নেতাকে নিজের দায়ভার ও অধীনস্তদের দায়ভার বহন করতে হয় *(আনকাবূত ২৯/১৩)*। অতএব এই তাক্বওয়াভিত্তিক ইসলামী খেলাফত হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণময় রাষ্ট্রব্যবস্থা।

বস্তুতঃ ইসলামকে যেমন কোন একটি দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট বলে গণ্য করা যায় না, ইসলামী খেলাফতকেও তেমনি নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য গণ্য করা যায় না। বরং এটি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। যেমন আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস, মাটি ও পানি সবার জন্য সমভাবে কল্যাণকর।

ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা

(متطلّبات الخلافة الإسلامية)

ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। আর ইসলামী খেলাফত আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত কল্যাণময় শাসনব্যবস্থার নাম *(নূর ২৪/৫৫)*। যার মধ্যে সকল যুগের সকল মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়েও ইসলাম চিরন্তন হেদায়াত পেশ করেছে।

অতঃপর ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা একারণে, যাতে মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে ইসলামী বিধান সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারে এবং মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে পূর্ণ মানবাধিকার ভোগ করতে পারে। সেকারণ ইসলামী

১২. মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়-১৭, রাবী বুরায়দা (রাঃ)।

খেলাফত প্রতিষ্ঠা মুমিনের ঈমানী দাবী। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً– ‘আর আল্লাহ কখনোই মুমিনদের উপর কাফেরদের কোন অধিকার সাব্যস্ত করবেন না’ *(নিসা ৪/১৪১)*। বস্তুতঃ কুফরী আদর্শের অধীনে শাসিত হওয়ার অর্থই হ’ল কাফেরের অধীনে শাসিত হওয়া।

দৃষ্টান্ত : ১৫ হিজরীতে ইয়ারমূক যুদ্ধের পর ইরাক বিজয় উপলক্ষ্যে ক্বাদেসিয়া যুদ্ধে পারস্য সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সা‘দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে তার নিকটে মুসলিম পক্ষের একজন জ্ঞানী প্রতিনিধি পাঠাতে বলেন। তখন হযরত মুগীরা বিন শো‘বা (রাঃ)-কে তার নিকটে পাঠানো হয়। তিনি উপস্থিত হ’লে সেনাপতি রুস্তম তাকে বলেন (ক) আপনারা আমাদের প্রতিবেশী। আপনাদের প্রতি আমরা সদ্ব্যবহার করব। আপনারা ব্যবসা করতে এলে আমরা সুযোগ দেব। উত্তরে মুগীরা বিন শো‘বা (রাঃ) বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়া নয়, বরং আখেরাত। আল্লাহ আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি একটি সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তা থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে লাঞ্ছিত হবে। আর যে তাকে আঁকড়ে ধরবে, সে সম্মানিত হবে’। রুস্তম বললেন (খ) সে দ্বীনটি কি? তিনি বললেন, সেই দ্বীনের স্তম্ভ হ’ল, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। সেই সাথে তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে যা নিয়ে আগমন করেছেন, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। রুস্তম বললেন (গ) এটি কতই না সুন্দর! এছাড়া আর কি? মুগীরা বললেন, إِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ– ‘মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র গোলামীতে ফিরিয়ে নেওয়া’। রুস্তম বললেন (ঘ) এটাও সুন্দর! এছাড়া আর কি? মুগীরা বললেন, মানুষ সবাই আদম সন্তান। তারা পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়ে ভাই ভাই। রুস্তম বললেন (ঙ) এটাও সুন্দর! অতঃপর তিনি বললেন, যদি আমরা আপনাদের দ্বীনে প্রবেশ করি, তাহ’লে কি আপনারা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবেন? মুগীরা বললেন, إِي وَاللهِ ثُمَّ

لاَ نَقْرَبُ بِلاَدَكُمْ إِلاَّ فِي تِجَارَةٍ أَوْ حَاجَةٍ– 'আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই। অতঃপর আমরা আপনাদের নিকটবর্তী হব না ব্যবসা কিংবা বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া'। রুস্তম বললেন (চ) এটাও সুন্দর! অতঃপর মুগীরা (রাঃ) বেরিয়ে গেলে রুস্তম তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে ইসলাম বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু তারা এটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইসলামে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন।

এদিকে মুসলিম সেনাপতি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) মুগীরা (রাঃ)-এর খোঁজে রিব'ঈ বিন 'আমেরকে পাঠান। তিনি গিয়ে দেখেন, রুস্তম মণি-মুক্তা খচিত ঝলমলে কক্ষে স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চাসনে বসে আছেন। এমতাবস্থায় রিব'ঈ সেখানে নিজের ছোট ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে মোটা কাপড়, তরবারী, বর্শা ও ঢাল সহ হাযির হ'লেন। যা কার্পেটের একাংশ পদদলিত করল। রক্ষীরা বলল, আপনি অস্ত্র নামান! তিনি বললেন, আমি আপনাদের নিকট আসিনি। আপনারা আমাকে ডেকেছেন বলেই এসেছি। যদি আপনারা আমাকে এই অবস্থায় থাকতে দেন, তাহ'লে ভাল। নইলে আমি ফিরে যাব'। তখন রুস্তম রক্ষীদের বললেন, ওনাকে আসতে দাও! অতঃপর তিনি বর্শার উপর ভর করে প্রবেশ করেন। যাতে মূল্যবান মখমলের কার্পেট ও বালিশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। তারা বলল (ক) আপনাদের কাছে কি এসেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহ্র দাসত্বে নিয়ে যাই, যাকে আল্লাহ চান। দুনিয়াকে অসচ্ছলতা থেকে সচ্ছলতায় ফিরিয়ে নেই। বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা হ'তে মুক্ত করে মানুষকে ইসলামের ন্যায়বিচারের অধীনে নিয়ে যাই। তাঁর রাসূলকে তিনি সৃষ্টিজগতের নিকট প্রেরণ করেছেন তাঁর সত্য দ্বীনসহ। যে ব্যক্তি সে দ্বীন কবুল করবে, আমরা তাকে কবুল করব এবং তার থেকে ফিরে যাব। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না আমরা ফিরে যাই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির নিকট। তারা বলল (খ) 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি' কি? তিনি বললেন, জান্নাত। আর যারা বেঁচে যায়, তাদের জন্য বিজয়'।

রুস্তম বললেন (গ) আমরা আপনাদের কথা শুনলাম। আপনারা কি বিষয়টি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কতদিন

চান? একদিন বা দু'দিন? রুস্তম বললেন (ঘ) না। যাতে আমরা লিখিতভাবে আমাদের নেতৃবৃন্দের নিকট বিষয়টি জানাতে পারি। রিব'ঈ বললেন, আমাদের রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যুদ্ধাবস্থায় বিরোধী পক্ষকে তিন দিনের বেশী সময় দেওয়ার রীতি নির্ধারণ করেননি'। রুস্তম বললেন (ঙ) আপনি কি আপনার দলের নেতা? তিনি বললেন, না। তবে মুসলিমরা সকলে ভাই ভাই। তারা সবাই একই দেহের অঙ্গ সমতুল্য'।

অতঃপর রুস্তম তার নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করেন এবং বলেন, তোমরা কি এই ব্যক্তির বক্তব্যের ন্যায় স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্য কখনো শুনেছ? তারা বলল, মা'আযাল্লাহ (আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি)! আপনি কি এই লোকটির কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন? আপনি কি এই কুত্তার জন্য আপনার দ্বীনকে পরিত্যাগ করবেন? আপনি কি লোকটির পোষাকের দিকে দেখেননি? রুস্তম বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! তোমরা পোষাকের অবস্থা দেখোনা। বরং তার বিচক্ষণতা, বাগ্মীতা ও চরিত্র দেখ। আরবরা পোষাক ও খাদ্যকে হালকা করে দেখে। তারা তাদের আত্মসম্মানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়'।[১৩]

উক্ত বৈঠকের পরবর্তী অবস্থা হ'ল এই যে, রুস্তম পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট যথারীতি রিপোর্ট পেশ করলেন এবং এটাও বললেন যে, প্রতিনিধি যিনি এসেছিলেন, তিনি ওদের নেতা নন। কিন্তু তিনি তাদের জাতির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই আমি মনে করি –وَاللهِ ذَهَبُوا بِمَفَاتِيحِ أَرْضِنَا 'আল্লাহ্‌র কসম! ওরা আমাদের মাটির চাবিগুলো নিয়ে গেল' *(আল-বিদায়াহ ৭/৪৩)*।

অতঃপর পারস্য সম্রাট কিসরার নির্দেশক্রমে যথারীতি তিনদিন পরে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সা'দ প্রচণ্ড বাত-বেদনায় আক্রান্ত ছিলেন। সেই সাথে সারা দেহে ফোঁড়ার যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তিনি খালেদ বিন উরফূতাহকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং ছাদের উপরে বালিশে উপুড় হয়ে শুয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখছিলেন।

---

১৩. ইবনু কাছীর দিমাশক্বী (৭০১-৭৭৪ হি.), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, প্রকাশকাল : ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খৃ. ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫,৭০৭) ৭/৩৭-৪০ পৃ.।

এই সময় মদ্যপানের দণ্ডপ্রাপ্ত ও বন্দী আবু মেহজান এসে বলল, হে সেনাপতি! আল্লাহ্‌র কসম! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি যুদ্ধ করে এসে পুনরায় বন্দীশালায় প্রবেশ করব। তখন সেনাপতি তাকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর সে সেনাপতির তরবারি নিয়ে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধে চলে গেল। অতঃপর ওয়াদামতে সন্ধ্যায় ফিরে এসে বন্দীশালায় প্রবেশ করল। এতে খুশী হয়ে সেনাপতি সা'দ তাকে মুক্ত করে দেন। এই ছোট্ট ঘটনায় বুঝা যায় যে, মুসলমান ইসলামের জন্যে তাদের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে।

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৭ থেকে ৮ হাযার এবং পারস্য পক্ষে ছিল ৬০ হাযার সৈন্য। চতুর্থ দিন দুপুরে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ও ঘনঘটায় রুস্তম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং সেনাপতি রুস্তম নিহত হন। এ সময় তাদের ১০ হাযার সৈন্য ও মুসলিম পক্ষে আড়াই হাযার সৈন্য নিহত হয়। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী রাজধানী মাদায়েনে কিসরার প্রাসাদ দখল করে নেয় এবং বহুমূল্য গণীমত সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

এদিকে খলীফা ওমর (রাঃ) যুদ্ধের খবর জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে মদীনার বাইরে অনেক দূর হেঁটে আসেন। ইতিমধ্যে সেনাপতি সা'দের পাঠানো দূত সেখানে পৌঁছে যায়। ওমর তার নিকট যুদ্ধে বিজয়ের ঘটনা শুনতে শুনতে মদীনায় পৌঁছে যান। তখন লোকদের আগমনে দূত বুঝতে পারে যে, ইনিই খলীফা। তখন সে দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে খলীফাকে বলে, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি কি বলবেন না যে আপনি খলীফা? ওমর বললেন, لاَ حَرَجَ عَلَيْكَ يَا أَخِيْ! 'তোমার কোন দোষ নেই হে আমার ভাই!' *(আল-বিদায়াহ ৭/৪৪ পৃ.)*।

উপরোক্ত বিবরণে ইসলামী খেলাফতের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তির ভ্রাতৃসুলভ আচরণ ও তার সারল্য বিশ্বকে চমকিত করে। ইতিহাসে যার তুলনা নেই।

ইসলামী খেলাফতের সার্বজনীনতা

(شمولية الخلافة الإسلامية)

বিদায় হজ্জের ভাষণে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،

‘হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোন প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত’। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। শোন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণের নিকট পৌঁছে দেয়’।[১৪] আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ– ‘হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ’তে পার।

১৪. বায়হাক্বী শো‘আব হা/৪৭৭৪; আহমাদ হা/২৩৫৩৬ রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৭০০; দ্র. লেখক প্রণীত ‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’ ৩য় মুদ্রণ ৭২২-২৩ পৃ. ‘আইয়ামে তাশরীক্বের ২য় দিনের ভাষণ’ অনুচ্ছেদ।

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছু সম্যক অবগত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

এতে বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল পরস্পরের পরিচিতির জন্য। পরস্পরে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নয়। অত্র আয়াতে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল ভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ইসলামের উদার বিশ্ব জাতীয়তার নীতি দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ কেবলমাত্র ইসলামী খেলাফতের অধীনেই নিরাপদ থাকে। বাকী সকল শাসন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকে।

একই দিনের অপর ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[১৫] মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, তার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ- 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[১৬]

হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ...- 'আমি

---

১৫. হাকেম হা/৩১৮ হাদীছ ছহীহ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ); দ্র. 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ৩য় মুদ্রণ 'আইয়ামে তাশরীক্বের ২য় দিনের ভাষণ' অনুচ্ছেদ, ৭২৩ পৃ.।

১৬. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, তাহকীক : মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যামী; মিশকাত হা/১৮৬ তাহকীক আলবানী, সনদ হাসান; মির'আত হা/১৮৬-এর ব্যাখ্যা।

তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ'ল দিবসের ন্যায়। আমার পরে এই দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত'...।[১৭] এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে পরিচালিত ইসলামী খেলাফতেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত। এর বাইরে গেলে মানুষ ধ্বংস হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি অনুগত থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা

(سلسلة الفتوحات الإسلامية)

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَآءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ إِذَا شَآءَ أَنْ يَّرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَآءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَآءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مَلِكًا عَاضًّا فَيَكُوْنُ مَا شَآءَ اللهُ أَنْ يَّكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ أَنْ يَّرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ مَلِكًا جَبَرِيًّا فَتَكُوْنُ مَا شَآءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَآءَ أَنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ-

'তোমাদের মধ্যে (১) নবুঅত থাকবে যতদিন আল্লাহ তা রাখতে চান। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন, যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চান। এরপর (২) নবুঅতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। যতদিন আল্লাহ তা রাখতে চান। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চান।[১৮] অতঃপর

১৭. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৩৭।

১৮. আবুদাঊদ হা/৪৬৪৬; তিরমিযী হা/২২২৬; আহমাদ হা/২১৯৬৯ প্রভৃতির বর্ণনায় এই খেলাফতের মেয়াদ স্পষ্টভাবেই চার খলীফার আমলে 'ত্রিশ বছর' বলে উল্লেখিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৫৩৯৫, সনদ হাসান, 'ফিতান' অধ্যায়)*। যা হাসান (রাঃ)-এর খেলাফত কাল সহ ১১ হি. হ'তে ৪১ হি. সনের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে *(আলবানী, ছহীহাহ হা/৪৫৯)*।

(৩) অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। যতদিন আল্লাহ তাদের রেখে দিবেন। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর (৪) জবর দখলকারী শাসকদের আগমন ঘটবে। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চান। এরপর (৫) নবুঅতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। এই পর্যন্ত বলে তিনি চুপ হয়ে যান'।[১৯]

উপরোক্ত হাদীছের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এখন নামে ও বেনামে ৪র্থ যামানা অর্থাৎ জবর দখলকারী শাসকদের যামানা চলছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মানুষকে প্রথমে ইসলামের গণ্ডীমুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর গণতন্ত্রের নামে মানুষকে মানুষের দাসত্বে আবদ্ধ করা হয়েছে। 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' এই সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষ এখন মানুষের উপর রব-এর আসন দখল করেছে। নির্বাচনী রাজনীতির নামে নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার এখন শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রদ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী যালেমদের জয়জয়কার চলছে। মানবতা সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে। পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়, তা হ'ল 'ইসলাম'। প্রচলিত 'পপুলার' ইসলাম নয়, বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের 'পিওর' ইসলাম। সেই ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হ'লেই তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কাঙ্ক্ষিত ইসলামী সমাজ ও কল্যাণময় ইসলামী খেলাফত। ফিরে পাবে মানুষ তার সত্যিকারের মানবাধিকার। আলোচ্য আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছে।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীতে ১২ জন ন্যায়পরায়ণ খলীফার আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[২০] সেকারণ বিদ্বানগণের মতে

---

১৯. আহমাদ হা/১৮৪৩০ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৩৭৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬; ছহীহাহ হা/৫।
২০. বুখারী হা/৭২২২, ৭২২৩; মুসলিম হা/১৮২১; মিশকাত হা/৫৯৭৪ 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, অনুচ্ছেদ-১, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৩১।

খেলাফতে রাশেদাহ্র মেয়াদ ৩০ বছরে সীমিত নয়। বরং চার খলীফার পরেও যুগে যুগে উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন খলীফাদের আগমন ঘটবে। যেমন উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি./৭১৭-৭২০ খৃ.), আব্বাসীয় খলীফা হারূণুর রশীদ (১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খৃ.) এবং তাঁদের ন্যায় অনেক খলীফা। আর সবশেষে আসবেন ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ)।[২১] অতএব উক্ত হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফাদের নমুনা হ'লেন প্রথম চারজন খলীফা। অতঃপর তাঁদের পরবর্তী খলীফাগণ তুলনামূলকভাবে তাদের কাছাকাছি নমুনার হবেন।

---

২১. **মাহদী :** আবুদাঊদ হা/৪২৮২-৮৫ 'মাহদী' অধ্যায়-৩০; তিরমিযী হা/২২৩০-৩২; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৩, ৮৫-৮৬ 'মাহদীর আগমন'অনুচ্ছেদ-৩৪ 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা' অধ্যায়-৩৫; মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৫ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়-২৭, 'ক্বিয়ামতের পূর্বলক্ষণ সমূহ' অনুচ্ছেদ-১; ছহীহাহ হা/১৫২৯, ২৩৭১; হাকেম ৪/৫৫৭-৫৮। **ঈসা :** মুসলিম হা/২৯০১ (৪১); মিশকাত হা/৫৪৬৪; মুসলিম হা/২৯৩৭; তিরমিযী হা/২২৪০; মিশকাত হা/৫৪৭৫; ছহীহাহ হা/৪৮১; বুখারী হা/৩৪৪৮; মুসলিম হা/১৫৫; মিশকাত হা/৫৫০৫। **ঈসা ও মাহদী :** মুসলিম হা/১৫৫-৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৬-০৭ 'ঈসার অবতরণ' অনুচ্ছেদ।

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফত

(الملوكية والديمقراطية والخلافة)

পৃথিবীতে এযাবত উপরোক্ত তিনটি শাসনব্যবস্থা দেখা গিয়েছে। তিনটি পরিভাষার মধ্যে তিনটি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। 'গণতন্ত্রে' জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত এবং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। আর 'খেলাফতে' অহি-র বিধানই চূড়ান্ত এবং আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।

(১) 'রাজতন্ত্রে' রাজা নিজ বাহুবলে রাজ্য জয় করেন ও নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করেন। রাজা সৎ, যোগ্য ও সুশাসক হ'লে রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। রাজা ইসলামপন্থী হ'লে তাঁর দ্বারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠাও সম্ভব। বিগত দিনে এমনকি বর্তমান বিশ্বেও এর নযীর রয়েছে। তবুও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যেহেতু রাজা বা রাণীরূপে একজন ব্যক্তির হাতে থাকে এবং তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সবকিছু বলে বিবেচিত হয়, সেকারণ এই শাসন ব্যবস্থা আদর্শিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

(২) 'গণতন্ত্রে' জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে। সংখ্যালঘু দল বা দলগুলি বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হয়। তাদের সম্মিলিত ভোট যদি সংখ্যাগুরু দলের প্রাপ্ত ভোটের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি তারা দেশ শাসনের অনুমতি পায় না। যেমন কোন নির্বাচনে যদি ১০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ৯টি দলের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা যদি ১০০টির মধ্যে ৮৯টি হয়, তখন বাকী ১১টি ভোট পাওয়া দলটি ১টি ভোট বেশী পাওয়ায় বিজয়ী দল বলে গণ্য হয়। অতঃপর তারাই দেশ শাসনের অনুমতি পায়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল দেশের অধিকাংশ বৈধ নাগরিক ভোট দেয় না। ফলে গণতন্ত্রের নামে অধিকাংশ দেশেই চলে সংখ্যালঘুর শাসন। যেমন ১৯৪৭-য়ে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এযাবত কোন দলই সেদেশে জাতীয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এমনকি ২০১৯ সালে ভারতে ভূমিধ্বস বিজয়ী বলে অভিহিত হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দল 'বিজেপি' যারা সর্বোচ্চ আদালতের রায় নিয়ে এখন 'বাবরী মসজিদে'র

স্থানে 'রাম মন্দির' নির্মাণের তোড়জোড় করছে এবং 'এনআরসি'[২২] নামে কালো আইন তৈরী করে সেদেশ থেকে মুসলিম বিতাড়নের নীলনকশা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছে, তাদের জোটও এবার ৩৮ শতাংশের বেশী ভোট পায়নি। এভাবেই প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণের নামে চলে যবরদস্তী দলীয় শাসন। একটি দলের কিংবা দলনেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার করা হয়। তাছাড়া প্রতি চার, পাঁচ বা ছয় বছর অন্তর নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে এইসব দেশে সর্বদা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থা বিরাজ করে।

গণতন্ত্রে নেতৃত্বের জন্য কোনরূপ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানদণ্ড নির্ধারিত না থাকায় সাধারণতঃ অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটে। যার প্রত্যক্ষ কুফল ভোগ করে সাধারণ জনগণ। এইসব দেশে সরকারী ও বিরোধী দলের লড়াই-সংঘর্ষ, হরতাল-সন্ত্রাস ও প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মানসিকতা সর্বদা বিরাজমান থাকে। ফলে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিত হন। যোগ্য ব্যক্তিগণ বিচ্ছিন্ন হন। দলীয়করণ প্রকট আকার ধারণ করে। নির্দলীয় বা অপর দলীয় গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের সেবা থেকে প্রশাসন ও জনগণ বঞ্চিত হয়। ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বক্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের কদর বেশী হওয়ার কারণে প্রচারবিমুখ যোগ্য, গুণী ও আল্লাহভীরু সৎলোকদের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে থাকেনা বললেই চলে। সর্বোপরি জনমতের কোন স্থিরতা না থাকায় এবং সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে বা বুঝের কমবেশীর কারণে ঘন ঘন জনমতের পরিবর্তন হওয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান কখনোই জনকল্যাণের স্থায়ী সংবিধান নয়।

গণতন্ত্রে জনগণের অংশীদারিত্বের কথা বলা হ'লেও কেবল ভোটের সময় কিছু লোকের ভোট দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই জনমতের তোয়াক্কা করা হয় না। ফলে অসন্তুষ্ট জনগণ হরতাল-ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল, অনশন, গালি-গালাজ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ভাঙচুরের পথ বেছে নেয়। এইভাবে গণতন্ত্র অবশেষে ঝগড়াতন্ত্র ও বন্দুকতন্ত্রে পরিণত হয়। যার তিক্ত ফল প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও ভোটকেন্দ্র দখলের জন্য সশস্ত্র ক্যাডার ও ভাড়াটিয়া

২২. National Register of Citizens (NRC) তথা 'জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন' ২০১৯; দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয় কলাম, অক্টোবর ২০১৯, ২৩/১ সংখ্যা।

মস্তানদের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে ভোটের বাক্স ভরে রাখা হচ্ছে। এছাড়া লাখ লাখ ভুয়া ভোটার তৈরী করা হচ্ছে। যাতে আসল ভোটাররা ভোট না দিলেও ভুয়া ভোট দিয়ে সরকারী দল উৎরে যেতে পারে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ব্যাপক ঘুষ ও কালো টাকার ছড়াছড়ি। ফলে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র জনমত প্রতিফলনের যথার্থ বাহন নয়।

তাছাড়া গণতন্ত্রে দু'টি শিরক রয়েছে। (ক) জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। (খ) অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে ইসলামে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। মুসলমান কোন অবস্থায় শিরকের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। যদিও আমরা সেটাই করছি হর-হামেশা।

(৩) 'খেলাফত' হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত পথে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিদের শাসনব্যবস্থার নাম। এই শাসনব্যবস্থায় আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। খলীফা বা আমীর ও তাঁর পুরা প্রশাসনযন্ত্র আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের বাস্তবায়নকারী মাত্র। তাই 'খেলাফত' ব্যতীত বাকী সকল ব্যবস্থাই মানুষের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার বাহন ব্যতীত কিছু নয়।

মন্তব্য : দেড় হাযার বছর পূর্বেকার ন্যায় বর্তমানেও চলছে সারা বিশ্বে নামে-বেনামে আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনতাইয়ের মহড়া। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা লুট করে তা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে। জনগণের শাসনের নামে তারা নিজেদের শাসন চালায়। গণ আদালতের দোহাই পেড়ে তারা আল্লাহ্র আদালতে জওয়াবদিহিতাকে এড়াতে চায়। ইচ্ছামত আইন তৈরী করে তারা ওটাকেই জনগণের আইন বলে সর্বদা মিথ্যাচার করে।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার নিকট শরী'আতের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। জায়েয ও নাজায়েয, সুন্নাত ও বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে তাদের নিজেদের ফৎওয়ার উপর। কখনওবা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনওবা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের

অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনওবা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রচলিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও মাযহাবী তাক্বলীদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নামীয় বিভেদাত্মক জাহেলী মতবাদের চক্রান্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। পার্লামেন্টে 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এবং 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'- এই দুই শিরকী কালেমাকে স্বীকার করে নিয়েই এরা রাজনীতিতে নেমেছেন। এরা 'আল্লাহ' এবং 'ইসলামের' নামেই জনগণের নিকট ভোট চাইছেন। এদের ভোট না দেওয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া বলে গণ্য করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়- বহু দলে বিভক্ত এই রাজনীতিকরা প্রত্যেকেই ভাবেন, তার দলকে ভোট দিলেই কেবল এদেশে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, নইলে নয়।

ট্রাজেডী এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শিরকী বিষবৃক্ষের ফল খেয়েই এঁরা রাজনীতি করছেন এবং সেখানে ইসলামকে ব্যবহার করছেন। প্রশ্ন করলে বলা হয় 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কখনো কখনো শিরককেও বরদাশত করা চলে' (নাঊযুবিল্লাহ)। আল্লাহ্র নিকট ঐসব যুক্তিবাদীরা কি কৈফিয়ত দিবেন সে প্রশ্ন না রেখেও একথা হলফ করে বলা চলে যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লব কেবলমাত্র ইসলামী তরীকার মাধ্যমেই আসা সম্ভব, পাশ্চাত্যের শিরকী তরীকার মাধ্যমে নয় *('খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায়' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)*।

খেলাফত হ'তে মুলূকিয়াত?

(من الخلافة إلى الملوكية؟)

অনেকের ধারণা ৩০ বছর ব্যাপী খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ৪১ হিজরী থেকে রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়। এজন্য তারা জালীলুল ক্বদর ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া, হযরত আমর ইবনুল 'আছ, মুগীরাহ বিন শো'বা, মা আয়েশা ছিদ্দীকা, হযরত ত্বালহা, যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) প্রমুখ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ছাহাবীদের সম্মান ক্ষুন্ন করে থাকেন। অথচ বিষয়টি সত্য নয়, বরং বাস্তবতার বিপরীত।

হযরত মু'আবিয়া (নবুঅতপূর্ব ৫ম-৬০ হি./৬০৫-৬৮১ খৃ.) রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর হাতে খেলাফত সমর্পণের অর্থ ইসলামী 'খেলাফতে'র সুউচ্চ মিনার থেকে 'মুলূকিয়াত' তথা রাজতন্ত্রের অন্ধকার গলিতে পতন নয়। বরং এটি ছিল খেলাফতের আসনে কেবল ব্যক্তির পরিবর্তন। নইলে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইন-কানূন তাই-ই ছিল, যা পূর্ববর্তী খলীফাগণের সময়ে ছিল।

জানা আবশ্যক যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত লেখকদের অন্যতম ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগ থেকে একাদিক্রমে ২০ বছর সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। পরে খলীফা হিসাবে আরও ২০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁর তাক্বওয়া, সততা, আমানতদারী, শাসন দক্ষতা, দূরদর্শিতা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক অনেকের চাইতে বেশী ছিল। তিনি কখনোই আল্লাহ্র আইনের বাইরে নিজের মনগড়া আইন চালু করেননি। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে বাতিল করে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। অতএব 'আমীরুল মুমিনীন' হিসাবে তিনি পূর্বসূরীদের ন্যায় নিঃসন্দেহে 'খলীফা' ছিলেন।[২৩]

প্রচলিত অর্থে তিনি কখনোই 'রাজা' বা 'সম্রাট' ছিলেন না। তবে তাঁর সময়কার খেলাফতের আয়তন পূর্ববর্তী খলীফাগণের তুলনায় অনেক বড় ছিল বিধায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বেশী ছিল। নবুঅতের বরকত থেকে এ যুগ অনেক দূরে ছিল। যা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগ থেকে নিঃসন্দেহে নিম্নতর ছিল। যেমন এক সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, مَا بَالُ الْمُسْلِمِيْنَ اخْتَلَفُوْا عَلَيْكَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ 'আপনার সময়ে মুসলমানদের কি হ'ল যে, তারা আপনার বিরুদ্ধে বিরোধ করছে? অথচ আবুবকর ও ওমরের সময় এরূপ ছিলনা। জবাবে আলী (রাঃ) বলেন, لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا وَالِيَيْنِ عَلَى مِثْلِيْ وَأَنَا الْيَوْمَ وَالٍ عَلَى مِثْلِكَ، يُشِيْرُ إِلَى وَازِعِ الدِّيْنِ- 'এটা এজন্য যে, আবুবকর ও ওমর আমার মত লোকদের উপরে খলীফা ছিলেন। আর এখন

২৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইবনুল 'আরাবী মালেকী, আল-'আওয়াছেম মিনাল ক্বাওয়াছেম (রিয়ায : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ., মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮৮) ২০০, ২০৭-২১০ পৃ.।

আমি খলীফা হয়েছি তোমার মত লোকদের উপর'। ইবনু খালদূন বলেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর সময়কার মানুষের মধ্যে দ্বীনী দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[২৪]

কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইয়াযীদ (২৭-৬৪ হি.)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন দেওয়াকে গুরুতর অন্যায় বলে গণ্য করেন এবং এখান থেকেই ইসলামে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণায় পিতার পরে পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়াটাই রাজতন্ত্রের বড় প্রমাণ। অথচ হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রাঃ) যখন খলীফা হ'লেন, তখন কিন্তু এটাকে কেউ রাজতন্ত্র বলেননি। হাসান (রাঃ) স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করলে পরে মু'আবিয়া (রাঃ) সর্বসম্মতভাবে খলীফা নিযুক্ত হন। অনুরূপভাবে ইয়াযীদের স্বল্পকালীন (৬০-৬৪ হি.) খেলাফতের পর তার পুত্র মু'আবিয়া খলীফা হ'লে এবং তিনি স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করলে ও কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত না করলে মারওয়ান খলীফা হন। যিনি তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন না। অথচ আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের দেশগুলিতে আমরা দেখছি বৃটেন, জাপান, থাইল্যাণ্ড সহ বহু দেশ যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় তাদের রাজা বা রাণীকে মহা সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদায় রাষ্ট্রীয় খরচে লালন করে যাচ্ছে। কথিত গণতন্ত্রী দেশ শ্রীলংকা, ভারত ও বাংলাদেশে পারিবারিক শাসন চলছে বিগত কয়েক যুগ ধরে।

পাকিস্তানে ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের (১৯০৭-১৯৭৪ খৃ.) বিরুদ্ধে বয়সোত্তীর্ণ একজন বৃদ্ধা মহিলা মিস ফাতিমা জিন্নাহকে (১৮৯৩-১৯৬৭ খৃ.) প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী দলগুলির সাথে ইসলামপন্থী অনেক দলের সমর্থন দানের পিছনে সম্ভবতঃ একটাই যুক্তি ছিল যে, মিস ফাতিমা জিন্নাহ হ'লেন পাকিস্তানের জনক মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃ.) ছোট বোন। যদি এটাই যুক্তি হয়, তাহ'লে এটা রাজতন্ত্রী চিন্তাধারা নয় কি? বস্তুতঃ পিতার পর পুত্রের বিষয়টি বড় কথা নয়, বরং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করাটাই হ'ল বড় কথা।

---

২৪. মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুল আ'লমী, তাবি, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৯৩) ৩০তম অধ্যায়, ২১১ পৃ.।

আলী-মু'আবিয়া (রাঃ) দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

(نوع الخلاف بين علي ومعاوية)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব কখনোই খেলাফত দখলের দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং তা ছিল ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে সৃষ্ট দু'টি দলের মতভেদের দ্বন্দ্ব। একদল চেয়েছিলেন সর্বাগ্রে ওছমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলা নেওয়া হৌক। হযরত ত্বালহা, যোবায়ের, সা'দ, সাঈদ প্রমুখ আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্র চারজন ছাহাবী সহ মু'আবিয়া, আয়েশা, আমর ইবনুল 'আছ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের প্রমুখ ছাহাবীগণ ছিলেন এই দলে। অন্য দলের দাবী ছিল সর্বাগ্রে খলীফা নির্বাচন হৌক। আপোষে মতবিরোধের এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিল মুসলিম বেশধারী ইহূদী-খৃষ্টান কুচক্রীরা। ফলে সংঘটিত হয় উটের যুদ্ধ, ছিফফীনের যুদ্ধ প্রভৃতি। সেই সাথে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক।[২৫]

এ সময় ছাহাবীগণের ব্যাপারে শী'আ ও খারেজী দু'টি চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয়। তাদের বাইরে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যপন্থী আক্বীদা হ'ল, ছাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকের বিষয়ে আমাদের এই সুধারণা রাখতে হবে যে, তাঁরা কখনোই ক্ষমতার মোহে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হননি। বরং স্ব স্ব ইজতিহাদ মোতাবেক তাঁরা কাজ করেছেন। যাতে ভুল ও শুদ্ধ দু'টিই হবার অবকাশ ছিল। যদিও আলী (রাঃ) এক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন।[২৬] কেননা প্রথমে খলীফা নিযুক্ত না হ'লে ওছমান হত্যাকাণ্ডের বিচার করবেন কে?

ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার কারণ (سبب استخلاف يزيد) :

মু'আবিয়া (রাঃ) কেন স্বীয় পুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, তার প্রধান কারণ ছিল ইসলামী খেলাফতকে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার হাত থেকে

---

২৫. উটের যুদ্ধ ও ছিফফীনের যুদ্ধ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন : মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী), ২০/৩ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/১০০ এবং ২০/১২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রশ্নোত্তর ১/৪৪১।

২৬. ইবনু খালদূন, মুক্বাদ্দামা ২৮শ অধ্যায় ২০৫ পৃ.।

রক্ষা করা। দ্বিতীয়তঃ ইয়াযীদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ব্যতীত অন্য সকল ছাহাবীর একমত হওয়া। তৃতীয়তঃ ঐ সময় সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী বনু উমাইয়াদের ইয়াযীদ ব্যতীত অন্য কারু ব্যাপারে একমত না হওয়া।[২৭]

ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব ছিল না। বরং তৎকালীন সময়ের টাল-মাটাল রাজনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ছাহাবীগণের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব এসেছিল। যাদের মুখপাত্র ছিলেন খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ)। নইলে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ওমর ফারূক (রাঃ)-এর অনুকরণে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে দিয়ে একটি প্যানেল করে দিতে চেয়েছিলেন। যাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতারা খলীফা হিসাবে বেছে নিবেন। তারা হ'লেন : (১) সাঈদ ইবনুল 'আছ (২) আব্দুল্লাহ বিন 'আমের (৩) হুসায়েন ইবনু আলী (৪) মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৫) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (৬) আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের। কিন্তু নাযুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় দূরদর্শী প্রবীণ ছাহাবী হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) ইয়াযীদের ব্যাপারে পরামর্শ দেন। প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও পরে খলীফা তাতে সম্মত হন।[২৮]

ইয়াযীদের নিঃসন্দেহে যোগ্যতা ছিল। নইলে উম্মতের সেরা ব্যক্তিবর্গ তাঁকে খলীফা হিসাবে প্রস্তাব করতেন না এবং তাঁর নিকট বায়'আত নিতেন না। তাছাড়া পিতার স্থলে যোগ্য পুত্রের নেতা হওয়ায় শরী'আতে কোন বাধাও ছিল না। দাঊদ (আঃ)-এর পর তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) বাদশাহ হয়েছেন এবং আল্লাহ উভয়কে নবী হিসাবে মনোনীত করেছেন *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*। ইমাম যাহাবী বলেন, আমরা ইয়াযীদকে গালিও দেব না,

---

২৭. ইবনু খালদূন, মুক্বাদ্দামা ৩০শ অধ্যায় ২১০-২১১ পৃ.।

২৮. হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (১৯৪৫-২০২০ খৃ.), খেলাফত ও মুলূকিয়াত কি তারীখী ও শারঈ হায়ছিয়াত (খেলাফত ও রাজতন্ত্রের একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যালোচনা) [দিল্লী-৬ : মাকতাবা তারজুমান, ১ম প্রকাশ ১৯৯১ খৃ. মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২৪] ৪০৩ পৃ.; ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খৃ.) ৮/৮৫ পৃ.। আল-বিদায়াহ এবং খেলাফত ও মুলূকিয়াত উভয় গ্রন্থে 'হাসান বিন আলী' লেখা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবতঃ এটি মুদ্রণজনিত ভুল। কেননা হাসান বিন আলী ইতিপূর্বে ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-ইছাবাহ, ক্রমিক ১৭২১)*। আর ইয়াযীদ মনোনীত হয়েছেন ৬০ হিজরীতে।

ভালোও বাসব না। খলীফাদের মধ্যে তাঁর চাইতে নিম্নস্তরের অনেকে ছিলেন'।[২৯]

মূলতঃ শী'আদের বিদ্বেষপূর্ণ লেখনীতে প্রভাবিত হয়ে বহু ঐতিহাসিক ইয়াযীদকে কদর্যভাবে চিত্রিত করেছেন, যা প্রকৃত অবস্থা হ'তে অনেক দূরে।[৩০] ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। তাঁর এ পদক্ষেপ ছিল স্রেফ উম্মতে মুহাম্মাদীর সার্বিক কল্যাণ ও তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিবেচনায়। ইয়াযীদের নাম ঘোষণার পরে মু'আবিয়া (রাঃ) জনসমক্ষে যে ভাষণ দেন, সেখানে তিনি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন, اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَلَّيْتُهُ لِأَنَّهُ فِيمَا أَرَاهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ فَأَتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ، وَإِنْ كُنْتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلاَ تُتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ– 'হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে আমি তাকে স্থলাভিষিক্ত করেছি এজন্য যে, সে যথার্থভাবেই এর যোগ্য, তাহ'লে তুমি তাকে পূর্ণ সফলতা দাও। আর যদি আমি তাকে পুত্রস্নেহের কারণে স্থলাভিষিক্ত করে থাকি, তাহ'লে তুমি তাকে সফল হ'তে দিয়ো না'।[৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছিলেন,

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ إِنَّمَا عَهِدْتُ لِيَزِيْدَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ فَضْلِهِ، فَبَلِّغْهُ مَا أَمَلْتُ وَأَعِنْهُ– وَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا حَمَلَنِي حُبُّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ، فَاقْبِضْهُ قَبْلَ أَنْ يَّبْلُغَ ذَلِكَ–

'হে আল্লাহ! যদি ইয়াযীদকে তার যোগ্যতার কারণে আমি স্থলাভিষিক্ত করে থাকি, তাহ'লে তুমি তাকে সেই স্থানে পৌঁছে দাও, যার আমি প্রত্যাশা করি এবং তাকে সাহায্য কর। আর যদি এর পিছনে আমার পুত্রস্নেহ একান্ত

---

২৯. শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ. ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২,৮৭৫; এতদ্ব্যতীত الفهارس العامة বা সাধারণ সূচী সমূহ ২ খণ্ড, সর্বমোট ২৫ খণ্ড) ৪/৩৬ পৃ.।
৩০. বিস্তারিত দেখুন : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম' বই।
৩১. আল-বিদায়াহ ৮/৮০ পৃ.; খেলাফত ও মুলূকিয়াত ৪১৫ পৃ.।

কারণ হয়ে থাকে এবং সে এর যোগ্য না হয়, তাহ'লে খলীফা হওয়ার পূর্বেই তুমি তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও'।[৩২]

অতএব উম্মতের বুযর্গ ছাহাবীগণের প্রতি সুধারণা রেখেই আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বিশেষ করে মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাছ দো'আ রয়েছে, –أَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا وَاهْدِ بِهِ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে সঠিক পথের দিশারী ও সঠিক পথের অনুসারী বানাও এবং তার মাধ্যমে অন্যদের সঠিক পথ প্রদর্শন কর'।[৩৩]

একবার তিনি হযরত আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)*-কে লেখেন,

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلاَ تُكْثِرِي. فَكَتَبَتْ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُولُ : وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مَئُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ– 'আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি পত্র লিখুন। বেশী লিখবেন না। তখন তিনি লিখলেন, আপনার উপরে সালাম! অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করেন। আপনার উপর সালাম![৩৪] অতএব তখনকার পরিস্থিতিতে সার্বিক বিবেচনায় তিনি যে ইয়াযীদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, তা সঠিক ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

---

৩২. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ : ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ. ৫২ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪,১২২) ৪/১৬৯ পৃ.; সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.), তারীখুল খোলাফা (মিসর : মাতবা'আ সা'আদাহ, ১ম প্রকাশ : ১৩৭১ হি./১৯৫২ খৃ., মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৫২) ১৮২ পৃ.।

৩৩. তিরমিযী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/৬২৩৫ 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, 'সমষ্টিগত ফযীলতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আব্দুর রহমান বিন আবু 'আমীরাহ (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৯৬৯।

৩৪. তিরমিযী হা/২৪১৪; মিশকাত হা/৫১৩০ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১, রাবী মু'আবিয়া (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৩১১।

ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

(سبب دمار الخلافة العثمانية وتاريخها المختصر)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মদীনা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে ইহূদীরা মুসলমানদের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়। খেলাফতে রাশেদাহ, খেলাফতে উমাইয়া, আব্বাসীয়, স্পেনীয় ও সর্বশেষ ওছমানীয় খেলাফতের সকল যুগে এরা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সেজে ভিতর থেকে অন্তর্ঘাত মূলক কাজ করেছে।[৩৫]

ওছমানীয় খেলাফত কালে তারা খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় খেলাফত ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয় এবং সেই সাথে ফিলিস্তীন দখলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এই সময় আন্তর্জাতিক ইহূদী সংস্থার প্রধান থিওডোর হার্জেল (১৮৬০-১৯০৪ খৃ.) জার্মানী, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক তৈরী করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে ওছমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এসময় খেলাফতে চলছিল চরম আর্থিক দৈন্য। এটাকে সুযোগ হিসাবে নিয়ে হার্জেল ওছমানীয় খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের (১৮৭৬-১৯০৯ খৃ.) দরবারে ১৮৯৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তার বন্ধু নিওলনস্কিকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, হে খলীফা! আমরা আপনার আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য ২০ মিলিয়ন লীরা (তুর্কী মুদ্রা) দান করব। এর মধ্যে ২ মিলিয়ন থাকবে ফিলিস্তীনের জন্য এবং বাকী খেলাফতের ঋণ পরিশোধের জন্য। এছাড়া খলীফাকে প্রয়োজনে আমরা যেকোন ঋণ সহায়তা দেব'। তিনি বলেন, যদি আমরা ফিলিস্তীন পাই, তাহ'লে আমরা তুরস্কের জন্য আরও বহু অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করব *(৪১৬ পৃ.)*।

জওয়াবে খলীফা বললেন, إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَتَنَازَلَ عَنْ شِبْرٍ وَّاحِدٍ مِّنَ الْأَرَاضِي الْمُقَدَّسَةِ...إِنِّي لَا أُوَافِقُ عَلَي تَشْرِيْحِ جُثَّتِي وَأَنَا عَلَي قَيْدِ الْحَيَاةِ–

৩৫. খেলাফতে রাশেদাহ (১১-৪১ হি./৬৩২-৬৬১ খৃ.=৩০ বছর); খেলাফতে উমাইয়াহ (৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খৃ.=৯১ বছর); খেলাফতে আব্বাসিয়াহ (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খৃ.=৫২৪ বছর); স্পেনীয় খেলাফত (৯২-৮৯৭ হি./৭১১-১৪৯২ খৃ.=৮০৫ বছর); তুরস্কের ওছমানীয় খেলাফত (৬৮০-১৩৪২ হি./১২৮১-১৯২৪ খৃ.=৬৬২ বছর)। প্রতিষ্ঠাতা : ১ম ওছমান বিন আরতুগ্রুল (৬৫৬-৭২৬ হি./১২৫৮-১৩২৬ খৃ.)।

'আমি এই পবিত্র ভূমির এক বিঘত পরিমান মাটিও হ্রাস করতে পারব না।...আমি আমার দেহে ব্যবচ্ছেদ ঘটাতে দেব না, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি *(৪১৭ পৃ.)*। সুলতানের এই কড়া জবাব পাওয়ার পর ইহূদী নেতারা অন্য পথ ধরেন। তারা তুরস্কে তাদের দোসর নব্য তুর্কীদের দিয়ে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তাদের ইঙ্গিতে নতুন সংগঠনের জন্ম হয় 'জমঈয়াতুল ইত্তিহাদে ওয়াত তারাক্কী' বা 'ঐক্য ও উন্নয়ন সংস্থা'। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহীম তাইমূ ১৮৯৫ খৃ. পর্যন্ত বিদেশে ষড়যন্ত্র করেন *(৪২৫ পৃ.)*। তারপর দেশে ফিরে এসে ১৮৯৬ সালে তিনি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তারা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উস্কানী দিয়ে তাদেরকে খলীফার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তারা ইসলামী জাতীয়তাবাদের স্থলে তুর্কী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান ও বিভিন্ন গান তৈরী করেন। তারা চেঙ্গিস খাঁ (১১৬২-১২২৭ খৃ.) ও তৈমুর লং (১৩৩৬-১৪০৫ খৃ.)-কে তাদের জাতীয় বীর আখ্যায়িত করেন ও তাদের বিজয়গাথা গেয়ে গর্ববোধ করতে থাকেন। তারা বলেন, –نَحْنُ أَتْرَاكٌ وَكَعْبَتُنَا طُوْرَانُ 'আমরা তুর্কী জাতি। আমাদের কা'বা হ'ল তুরস্ক' *(৪২৬-২৭ পৃ.)*। তারা তাদের প্রচারপত্রে বলেন,

أَيُّهَا الْعُثْمَانِيُّوْنَ! إِنَّ مَقْصَدَنَا هُوَ سَلاَمَةُ الدَّوْلَةِ وَالْخِلاَفَةِ...إِسْتَيْقِظُوْا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ...الشَّجَاعَةُ مِنَّا وَالْعَوْنُ مِنَ اللهِ. نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ- إِنْهَضْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْمُوَحِّدُ وَانْقَذْ دِيْنَكَ وَإِيْمَانَكَ مِنْ يَدِ الظَّالِمِيْنَ. يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! إِنَّ السُّلْطَانَ عَبْدَ الْحَمِيْدِ -شَرْعاً- لَيْسَ بِسُلْطَانٍ وَلاَ خَلِيْفَةٍ وَمَنْ لاَيَصْدُقُ قَوْلَنَا هَذَا فَلْيَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ-

'হে ওছমানীগণ! আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রের ও খেলাফতের নিরাপত্তা। ...জেগে ওঠ হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! বীরত্ব আমাদের এবং সাহায্য আল্লাহ্‌র। সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং বিজয় আসন্ন।... উঠে পড় হে তাওহীদবাদী মুসলিম! তোমার দ্বীন ও ইসলামকে যালেমদের হাত থেকে

রক্ষা কর!... হে মুসলিমগণ! সুলতান আব্দুল হামীদ শরী'আত মতে কোন সুলতান নন বা খলীফা নন। যারা আমাদের এ কথা সত্য মনে করবেনা, তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহ দেখে নেয়' *(৪২৯ পৃ.)*।

বস্তুতঃ এই লোকগুলি ছিল ইস্রাঈলের গুপ্ত বাহিনী 'মোসাদ' (اَلْمَاسُوْنِيَّةُ)-এর চর। যারা ইসলামকে মুমিনের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অথচ তারাই ইসলামকে খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। তারা ১৯০৯ সালের ২৭শে এপ্রিল মঙ্গলবার তাদের কথিত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দীন আফেন্দীর নামে ও তাতে বহু আলেমের স্বাক্ষর নিয়ে একটি ফৎওয়া প্রচার করে। যাতে তারা খলীফাকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে একমত হয় *(৪৩১ পৃ.)*। অতঃপর তারা খলীফাকে পদত্যাগে বাধ্য করে এবং তাঁকে গ্রীসের অধিকাংশ ইহূদী অধ্যুষিত সালানীক (سَلاَنِيْكُ) দ্বীপে নির্বাসনে পাঠায় *(৪৩২ পৃ.)*।

উক্ত বিষয়ে ১৩২৯ হি. মোতাবেক ১৯০৯ সালে লেখা এক পত্রে খলীফা ২য় আব্দুল হামীদ (১৮৪২-১৯১৮ খৃ.) বলেন, 'জমঈয়তুল ইত্তিহাদ' আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে তাদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার অনুমতি চায়। এর বিনিময়ে তারা ১৫০ মিলিয়ন লীরা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আমি তাদের চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেই যে,

إِنَّكُمْ لَوْ دَفَعْتُمْ مِلْئَ الدُّنْيَا ذَهَباً، لَنْ أَقْبَلَ بِتَكْلِيْفِكُمْ هَذَا بِوَجْهٍ قَطْعِيٍّ، لَقَدْ خَدَمْتُ الْمِلَّةَ الْإِسْلاَمِيَّةَ وَالأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مَايَزِيْدُ عَلَى ثَلاَثِيْنَ سَنَةً فَلَمْ أُسَوِّدْ صَحَائِفَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'যদি তোমরা আমাকে দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ দাও, তথাপি আমি কখনোই তোমাদের এই অর্থ ভাণ্ডার গ্রহণ করব না। আমি ৩০ বছরের অধিককাল মুসলিম মিল্লাতের ও উম্মতে মুহাম্মাদীর খেদমত করে আসছি। অতএব আমি মুসলমানদের ইতিহাসের পাতা আদৌ কালিমালিপ্ত করব না' *(৪৩২ পৃ.)*। অতঃপর খলীফাকে সরিয়ে তারা তার ভাই ৫ম মুহাম্মাদকে (১৯০৯-১৯১৮ খৃ.) ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু তিনি ছিলেন 'জমঈয়তুল ইত্তিহাদ'-এর ক্রীড়নক মাত্র। বাস্তবে তাঁর কোন ক্ষমতা ছিলনা।

এ সময় তুর্কীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হয়। যদিও আরবীকে পাশাপাশি রাখা হয় *(৪৩৫ পৃ.)*। অতঃপর ইংরেজদের ইঙ্গিতে মুছতফা কামালকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান সেনাপতি করা হয়। সাথে সাথে তাকে ‘গাযী’ উপাধি দিয়ে বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার চালানো হয়। সেখানে তার অলীক বীরত্ব গাথা এবং তার প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা প্রকাশ হ’তে থাকে। তার জীবনীর উপর ক্রোড়পত্র ছাপা হয়। ইহূদীরা কামালকেই তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে *(৪৩৭-৩৯ পৃ.)*। অতঃপর তারা সুলতান ৫ম মুহাম্মাদকে সরিয়ে তার ভাই ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদকে ক্ষমতায় বসায় (১৯১৮-১৯২২ খৃ.)। অতঃপর ‘জমঈয়তুল ইত্তিহাদ’ সুলতান ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদকে বৃটেনে নির্বাসনে পাঠায় ও তাঁর স্থলে ২য় আব্দুল মজীদ বিন সুলতান আব্দুল আযীযকে ক্ষমতায় বসায় (১৯২২-১৯২৪ খৃ.)। তিনি ছিলেন ওছমানীয় খেলাফতের ৩৭তম ও সর্বশেষ খলীফা। মুছতফা কামাল তাকে গৃহবন্দী করে রাখেন। এমনকি ছালাতের জন্য মসজিদে যেতে দিতেন না। কেননা তিনি বের হ’লেই মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত। অতঃপর ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবর খেলাফত-এর স্থলে ‘প্রজাতন্ত্র’ ঘোষণা করা হয় এবং কামাল পাশাকে তার প্রধান নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর তিনি ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তারিখে ‘জমঈয়তুল ইত্তিহাদ’-এর এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে চিরতরে ‘খেলাফত’ বিলুপ্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর কামালকে (১৮৮১-১৯৩৮ খৃ.) ‘আতাতুর্ক’ বা তুর্কী জাতির পিতা এবং ‘পাশা’ উপাধি দিয়ে ক্ষমতায় বসানো হয়। এভাবে কামাল পাশার হাতেই খেলাফতের (৬৮০-১৩৪২ হি./১২৮১-১৯২৪ খৃ.) আলো নির্বাপিত হয় *(৪৪১ পৃ.)*। যে আলোর নীচে মুসলমানেরা ৬৬২ বছর ধরে বসবাস করে আসছিল। এই সময় প্রখ্যাত মিসরীয় কবি আহমাদ শাওক্বী বেগ (১৮৬৮-১৯৩২ খৃ.) খেলাফত হারানোর শোকে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন *(৪৪২-৪৩ পৃ.-ছাল্লাবী)*।

খেলাফতের আয়তন :

১৫১৭-১৫২০ সালে খলীফা ১ম সলীমের সময় ওছমানীয় খেলাফত পূর্ব ভূমধ্যাঞ্চলের সাইপ্রাস, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, ইস্রাঈল, দক্ষিণ তুরস্ক, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা এবং আরব ভূখণ্ডের হেজায, তেহামা ও মিসর সহ বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। যা খলীফা

চতুর্থ মুহাম্মদ (১৬৪৮-১৬৮৭ খৃ.)-এর সময় ১৬৮৩ সালে ২০ লক্ষ ৭ হাযার ৭৭১ বর্গমাইল তথা ৫২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

খেলাফত সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানোর সময় ওছমানীয় খলীফাগণ কনস্টান্টিনোপল থেকে আনাতোলিয়া, অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, ককেশাস এবং পূর্ব ইউরোপের অনেক গভীর পর্যন্ত শাসন করতেন। যা ১ম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খৃ.) শেষে মিত্র পক্ষের ভাগ-বাটোয়ারার পর বর্তমানে মাত্র ৩,০২,৫৩৫ বর্গমাইল তথা ৭,৮৩,৩৫৬ কি.মি.-য়ে দাঁড়িয়েছে। তুরস্ক এখন আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীর ৩৭তম দেশ। যা এক সময় ছিল পৃথিবীর ১ নম্বর দেশ, বরং মহাদেশ। মূলতঃ ১৯০৯ সালে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা প্রশ্নে আপোষহীন খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকেই ইংরেজদের চক্রান্তে ওছমানীয় খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন শুরু হয়। যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৫ বছর পর ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তারিখে বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি কামাল পাশার হাতে 'খেলাফত' উৎখাতের মাধ্যমে। যা ছিল জনমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এবং ইহূদী-নাছারাদের দোসর মাল ও মর্যাদা লোভী সামরিক ও বেসামরিক কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির চক্রান্তের কুফল মাত্র। অথচ একেই 'গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র' বলে বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। যে ধোঁকা বিভিন্ন দেশে অদ্যাবধি চলছে।

কামালের অপকীর্তি সমূহ (جرائم كمال باشا) :

ইংরেজদের ক্রীড়নক কামাল পাশা তার প্রভুদের ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। প্রথমেই তিনি ওয়াক্ফ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপর হস্তক্ষেপ করেন এবং মসজিদগুলিকে কব্জায় নেন। তিনি রাজধানী ইস্তাম্বুলের প্রধান দু'টি জামে মসজিদ বন্ধ করে দেন। আয়াসোফিয়া মসজিদকে জাদুঘর এবং আল-ফাতেহ মসজিদকে গুদাম ঘরে পরিণত করেন।[৩৬] অতঃপর তিনি

৩৬. 'আয়াসোফিয়া' মসজিদটি সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা মতে তুরস্কের ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোয়ান (জন্ম : ১৯৫৪ খৃ.) ২০২০ সালের ১০ই জুলাই পুনরুদ্ধার করেছেন ও পুনরায় সেটিকে জামে মসজিদ হিসাবে চালু করেছেন।

সরকারীভাবে ৩০০ জন ওয়ায়েয বা ধর্মীয় বক্তাকে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন জুম‘আর খুৎবায় কেবল সরকারের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের কথা বলতে এবং সেই সাথে সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করতে। তিনি হিজরী ক্যালেণ্ডার বাতিল করে বৃটিশ ক্যালেণ্ডার চালু করেন। ১৩৪৫ হিজরী মোতাবেক ১৯২৬ সাল থেকে তিনি সমস্ত ইসলামী আইন বাতিল করে দেশে সেক্যুলার আইন চালু করেন *(৪৪৩ পৃ.)*।

শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রবিবার করেন। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মীয় শিক্ষা ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হয়। অবশেষে ছাত্র অভাবে ১৯৩৩ সালে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী‘আহ অনুষদ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি তুর্কী পোষাক ছেড়ে সবাইকে পাশ্চাত্য পোষাক পরতে বাধ্য করেন। আরবী ও ফার্সী ভাষা বাতিল করে ল্যাটিন হরফে তুর্কী ভাষা লিখতে আদেশ দেন। বড় বড় শহরে তাঁর বিশাল বিশাল মূর্তি স্থাপিত হয় এবং সর্বত্র তাঁর নামের সাথে ‘আতাতুর্ক’ লিখতে বাধ্য করা হয়।[৩৭] বিদেশ থেকে সুন্দরী নর্তকী এনে তিনি সারা দেশে গান-বাজনার আসর বসান। মহিলাদের হিজাব খুলতে এবং নগ্ন পোষাক পরিধান করতে বাধ্য করেন। স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে তিনি পুরুষ ও নারীকে সমান বলে ঘোষণা দেন ও তাদেরকে একত্রে নাচ-গান ও নাটকে অভিনয় করতে বাধ্য করেন। তিনি কুরআনের মর্ম পাল্টিয়ে তুর্কী ভাষায় ভুল অনুবাদ করান এবং আরবী আযানের বদলে তুর্কী আযান চালু করেন। তিনি আরব ও ইসলামী বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ্চাত্যের সাথে পূর্ণ সংহতি ঘোষণা করেন। সে সময়ের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে তার একথা প্রমাণিত হয় যে, لَيْسَ لِتُرْكِيَا الْجَدِيْدَةِ عَلاَقَةٌ بِالدِّيْنِ– ‘আধুনিক তুরস্কের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই’। একথাও প্রকাশিত হয় যে, তিনি একদিন কুরআন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, বিগত দিনের আইন দিয়ে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়’ *(৪৪৩-৪৫ পৃ.)*।[৩৮]

---

৩৭. ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু’টি সড়ককে ‘কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ’ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

৩৮. ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী, (বেনগাযী, লিবিয়া) জন্ম ১৯৬৩ : আদ-দৌলাতুল ওছমানিইয়াহ (মদীনা মুনাউওয়ারাহ, মুওয়াসসাসাতু ইক্বরা ১ম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৩।

নিকট অতীতের উক্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা সামনে রাখুন। অতঃপর কুরআনের বাণী অনুধাবন করুন। যেখানে আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। তিনি আরও বলেন, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيرٍ– 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ কর। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান আসার পরেও, তাহ'লে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। তিনি মুসলমানদের চলার পথের মূলনীতি হিসাবে বলেন,

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ– 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। অথচ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইহূদী-নাছারা ও কুফরী আইন চলছে নিঃসংকোচে বাধাহীন গতিতে। সর্বত্র তাদের তোষণে ব্যস্ত মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা!

ফিলিস্তীন ট্রাজেডী (مأساة فلسطين) :

১৯১৪ সালে ১ম মহাযুদ্ধে ওছমানীয় খেলাফত অক্ষশক্তির সাথে যোগ দেয়।[৩৯] অতঃপর মিত্রশক্তির কাছে তাদের পরাজয়ের ফলে যুদ্ধ শেষে ওছমানীয় খেলাফত ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। 'ভার্সাই চুক্তি'র বলে বৃটেন ফিলিস্তীনকে নিয়ে নেয়। শুরু হয় বিপর্যয়। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেন কর্তৃক 'বেলফোর' ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯১৮ সাল থেকে বহিরাগত ইহূদীদের জন্য ফিলিস্তীনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে আইন পাশ করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহূদীরা এখানে এসে বসতি স্থাপন শুরু করে।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ১০,১৬২ বর্গমাইল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তীনে ১৯১৮ সালে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোকসংখ্যা ছিল ৭০,৮০০। এর মধ্যে আরব ছিল শতকরা ৯৩ ভাগ এবং বাদবাকী ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহূদী। মাত্র ৩০ বছর পরে ১৯৪৮ সালে যখন বৃটেন সেখান থেকে চলে আসে, তখন ফিলিস্তীনের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,৫০,০০০। যার মধ্যে ২ লাখ দেশীয় ইহূদী, ৪ লাখ বহিরাগত ইহূদী ও বাদবাকী সাড়ে ১৩ লাখ ছিল সুন্নী আরব মুসলিম।

---

৩৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১লা জুলাই ১৯১৪ এবং শেষ ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ (৪ বছর, ১৩৩ দিন)। উক্ত যুদ্ধে ১ম পক্ষে অর্থাৎ অক্ষশক্তি ছিল ওছমানীয় সাম্রাজ্য, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, জার্মানী ও বুলগেরিয়া। যাদের বলা হ'ত কেন্দ্রীয় শক্তি। অপরপক্ষে অর্থাৎ মিত্রশক্তি ছিল সার্বিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী, রুমানিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ফলাফল : ৯০ লক্ষ যোদ্ধা ও ৫০ লক্ষ নিরীহ মানুষ নিহত হয়। প্রায় ১ কোটি সৈন্য এবং ২ কোটি ১০ লক্ষ সাধারণ মানুষ আহত হয়। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ছিল এক লক্ষ ১৬ হাযার ৫১৬ জন। চারটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রুশ সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে, জার্মান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ১৯১৮ সালে এবং ওছমানীয় সাম্রাজ্য ১৯২৪ সালে। অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং তুরস্ক পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা অধিকাংশ আরব এলাকা ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের করতলগত হয়। ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪ খৃ.) নেতৃত্বে রাশিয়ার এবং ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্টরা মুসোলিনীর (১৮৮৩-১৯৪৫ খৃ.) নেতৃত্বে ইতালীর ক্ষমতায় আসীন হয়।

এ যুদ্ধের অন্যান্য ফলাফল হ'ল : ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ১০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। চরম দারিদ্র্য বয়ে আনে সর্বত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন করে। এই যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ছিল তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত অপমান। যার প্রতিশোধ স্বরূপ আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ ঘনীভূত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫ খৃ.) ছিল তারই মর্মান্তিক পরিণতি।

পশ্চিমা শক্তিসমূহের চাপে ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর 'জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ' ফিলিস্তীনের বিভক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে। যেখানে ফিলিস্তীনে একটি পৃথক আরব রাষ্ট্র ও একটি পৃথক ইহূদী রাষ্ট্র এবং যেরুযালেমের জন্য একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক অঞ্চল গঠনের কথা বলা হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তীনের ম্যাণ্ডেট ছেড়ে দেয় এবং ওই দিনই ইহূদী নেতারা স্বাধীন 'ইস্রাঈল' রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন। তার কয়েক মিনিট পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র করে নেয়। এরপর ইঙ্গ-মার্কিন ও ইস্রাঈলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে ১০ লক্ষ আরব মুসলিম নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আরব দেশ সমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর ফিলিস্তীনে থেকে যায় মাত্র ২,৪৭,০০০ নির্যাতিত আরব মুসলিম। ফিলিস্তীনের ৮০% ভূভাগ দখল করে নেয় আগ্রাসী ইস্রাঈলী দখলদাররা। সেদিন থেকে শুরু হয় ফিলিস্তীন ট্রাজেডী। সেই সাথে ক্রমাগতভাবে চলছে বহিরাগত ইহূদীদের নতুন নতুন বসতি স্থাপন। অথচ সেখানকার মূল আরব মুসলিম অধিবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাদের জন্ম ও মৃত্যু সেখানেই হচ্ছে রাষ্ট্রহীন অবস্থায়। সেই সঙ্গে ইস্রাঈলের পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে চলছে নিয়মিত রক্তের হোলিখেলা। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। ফিলিস্তীন আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার ও রক্তস্নাত ভূখণ্ড।[৪০]

পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' কি প্রগতির নামে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ত্রিবিধ ছুরির বলি নয়? তিনদিকে হিন্দুস্তান ও একদিকে সাগরবেষ্টিত এই স্বাধীন মুসলিম ভূখণ্ড কি সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের শিকার নয়? অতএব 'বুঝহ সুজন যে জানো সন্ধান'!

---

৪০. বিস্তারিত দেখুন লেখক কর্তৃক ইংরেজী থেকে অনূদিত ও হাফাবা প্রকাশিত 'আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীলনকশা' বই; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬; ২য় প্রকাশ ২০১৮ ইং।

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফতের মধ্যকার পার্থক্য

(الفرق بين الملوكية والديمقراطية والخلافة)

(১) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু'টিই মানব রচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নাম।

(২) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানুষের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতা। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং বান্দা মালিকের প্রতিনিধি মাত্র।

(৩) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়।

(৪) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানুষ মানুষের দাসত্ব করে। পক্ষান্তরে খেলাফতে মানুষ কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব করে।

(৫) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে মানুষের রচিত আইন সদা পরিবর্তনশীল। পক্ষান্তরে খেলাফতে অনুসৃত আল্লাহ্র আইন সর্বদা অপরিবর্তনীয়।

(৬) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে হালাল-হারাম নির্ধারণের মালিক হ'ল মানুষ। পক্ষান্তরে খেলাফতে উক্ত অধিকার কেবল আল্লাহ্র।

(৭) রাজতন্ত্রে 'রাজা' এবং গণতন্ত্রে 'দলনেতা' সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। পক্ষান্তরে খলীফা বা আমীরের ক্ষমতা আল্লাহ্র বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(৮) রাজতন্ত্রে রাজার নাবালক এমনকি অযোগ্য পুত্র-কন্যাগণ রাজা হ'তে পারেন। অনুরূপভাবে গণতন্ত্রে দলীয় প্রভাবে অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি নেতা নির্বাচিত হ'তে পারেন। কিন্তু ইসলামী খেলাফতে বিজ্ঞ নির্বাচক মণ্ডলীর পরামর্শের মাধ্যমে শরী'আত নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে যোগ্য ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই মাত্র খলীফা বা আমীর নির্বাচিত হ'তে পারেন।

(৯) রাজা কারু নিকটে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। অন্যদিকে দলীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে জওয়াবদিহিতার নামে নিজ দলের এম.পি-দের হাততালি কুড়ান এবং বিরোধী দলের বাক্যবাণে জর্জরিত হন। অথচ

খলীফা বা আমীর আল্লাহভীরু শূরা সদস্যদের নিকটে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং তাঁরাও ইসলামী আদব রক্ষা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরামর্শ সভায় ভিন্ন ভিন্ন মত এলেও আমীর সামগ্রিক বিবেচনায় কল্যাণকর কোন সিদ্ধান্ত নিলে সবাই তা শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর সেখানে 'নোট অফ ডিসেন্ট' দেওয়ার বা তা নিয়ে পরবর্তীতে কোন গ্রুপিং সৃষ্টির অবকাশ থাকেনা। শূরার সিদ্ধান্ত সকলের সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। কোনরূপ যদি-কিন্তুর সুযোগ সেখানে থাকেনা। যেমনটি মুনাফিকরা ওহোদ যুদ্ধের সময় ও পরবর্তীকালে করেছিল।[৪১] সিদ্ধান্তের পর সকলে মিলে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নের সাধ্যমত চেষ্টা করেন *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি' শব্দটি তোমাদের মধ্যে শয়তানের কর্মের দুয়ার খুলে দিবে' *(মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮)*।[৪২]

---

৪১. ওহোদের যুদ্ধে ইবনু উবাইয়ের নেতৃত্বে বেরিয়ে আসা মুনাফিকদের বিষয়ে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা কাফেরদের (মুনাফিকদের) মত হয়ো না, যারা তাদের (ঈমানদার) ভাইদের উদ্দেশ্যে বলে যখন তারা সফরে বের হয় কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যদি ওরা আমাদের সঙ্গে (মদীনায়) থাকত, তাহ'লে ওরা মরত না বা নিহত হ'ত না। এরূপ কথা দ্বারা আল্লাহ ওদের অন্তরে দুঃখ সঞ্চার করে দেন। অথচ আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সবই দেখেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৬)*।

৪২. পূর্ণ হাদীছটি নিম্নরূপ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ- 'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিক প্রিয়। আর (সবল-দুর্বল) প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং যা তোমার উপকার করবে, তার প্রতি তুমি লালায়িত হও এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। অক্ষম হয়ে বসে থেকো না। যদি কোন বিপদ তোমার উপর আপতিত হয়, তাহ'লে এরূপ বলো না যে, 'যদি' আমি এরূপ করতাম, তাহ'লে এরূপ এরূপ হ'ত। বরং বল যে, আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন সেটাই তিনি করেছেন। কেননা তোমার 'যদি' শব্দটি শয়তানের কর্মের দুয়ার খুলে দিবে' *(মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮ 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ)*।

(১০) রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা বা দলীয় সিদ্ধান্ত প্রধান বিবেচ্য হয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ্‌র বিধানই প্রধান বিবেচ্য হয়ে থাকে। এমনকি কুরআন বা ছহীহ হাদীছের দলীল থাকলে 'আমীর' শূরা সদস্যদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন। যেমনটি হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) উসামা বিন যায়েদকে জিহাদে প্রেরণের সময় এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় করেছিলেন।

(১১) রাজতন্ত্রে রাজাগণ আমৃত্যু এবং গণতন্ত্রে দলনেতা বা এম.পি-গণ মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত নিজেদের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু খেলাফত ব্যবস্থায় খলীফা ও কর্মকর্তাগণের কার্যকালের মেয়াদ নির্ভর করে তাদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের উপর।

(১২) রাজতন্ত্রে রাজার আদেশই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রে দলনেতা বা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। ফলে হকপন্থী একক ব্যক্তি বা সংখ্যালঘুর রায় সঠিক হ'লেও তা অনেক সময় বিবেচনায় আসে না। পক্ষান্তরে ইসলামে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। সেখানে আল্লাহ্‌র বিধান মতে সকলের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

(১৩) রাজতন্ত্রে রাজা হওয়ার এবং গণতন্ত্রে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলে। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' ব্যবস্থায় পদ ও ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা দু'টিই নিষিদ্ধ। এখানে কেবল মজলিসে শূরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত করেন। আমীর তাদের নিকটে ও আল্লাহ্‌র নিকটে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন।

॥ আহলেহাদীছ আন্দোলন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন ॥

‘খেলাফত’ প্রতিষ্ঠার উপায়

(طريق إقامة الخلافة)

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় হ’ল দু’টি : দাওয়াত ও জিহাদ। অর্থাৎ তাওহীদের মর্মবাণী জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া ও তাদের মর্মমূলে তা প্রোথিত করাই হ’ল প্রকৃত দাওয়াত। অতঃপর শিরক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হ’ল প্রকৃত জিহাদ। প্রথমটির মাধ্যমে ‘খেলাফত’ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হয়। তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হয়। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জনমত গঠন ও সমাজে পরিবর্তন আনতে হয়। এজন্য সমাজের প্রতিটি স্তরে, গ্রামে ও মহল্লায় যখন একদল সচেতন আল্লাহভীরু ও যোগ্য নেতা ও কর্মী তৈরী হবে, যারা আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য জান বাজি রেখে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে, তখন সংখ্যায় যত নগণ্যই হৌক, আল্লাহ্র সাহায্যে তারাই জয়লাভ করবে। এভাবে সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনকি ‘তিনজন মুমিন’ একস্থানে থাকলেও তাদেরকে একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য হাদীছে নির্দেশ এসেছে।[৪৩] অতঃপর বৃহত্তর সাংগঠনিক ইমারতের পথ বেয়েই একদিন জাতীয় ভিত্তিক ‘ইসলামী খেলাফত’ প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা নূর-এর ৫৫ আয়াতে ‘ঈমান’ ও ‘আমলে ছালেহ’-কে ‘খেলাফত’ লাভের পূর্বশর্ত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নিরংকুশভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র দাসত্ব করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের শেষে খেলাফত লাভকে গুরুত্বপূর্ণ নে‘মত হিসাবে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, যারা এই নে‘মত লাভের পরেও অকৃতজ্ঞ হয়, তারা ফাসেক বা পাপাচারী। পরের আয়াতে ছালাত কায়েমের মাধ্যমে জাতির নৈতিক শক্তি ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তি এবং সর্বক্ষেত্রে

---

৪৩. আহমাদ হা/৬৬৪৭; আবুদাঊদ হা/২৬০৮; মিশকাত হা/৩৯১১ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ); শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ‘আক্বযিয়াহ ও আহকাম’ অধ্যায় ১০/২৪৩ পৃ.।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের কথা বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে তাই তাদের হারানো খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা যরূরী। নইলে সারা জীবন ইহূদী-খৃষ্টান ও কুফরী শক্তির গোলামী করেই হীনকর জীবন কাটাতে হবে, যেভাবে এখন কাটাতে হচ্ছে।

উক্ত বিষয়ে পাকিস্তানের খ্যাতনামা বিদ্বান শায়খুল হাদীছ আল্লামা মোহাম্মাদ হোসায়েন গোন্দলভী যা বলেছেন, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইসলামী খেলাফত কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার উপায়গুলি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, বস্তুগত ও নৈতিক।

১. বস্তুগত উপাদান সমূহ (الأسباب المادية) : এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন-

(ক) ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা : আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَّلاَ تَفَرَّقُوْا، 'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে আঁকড়িয়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

(খ) আপোষে ঝগড়া না করা : আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا، 'আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে হিম্মত হারিয়ে ফেলবে এবং তেজ উবে যাবে। আর তোমরা ছবর কর' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

(গ) অলসতা ও বিলাসিতা পরিহার করা : আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ– 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

(ঘ) নেতার প্রতি অনুগত থাকা : আল্লাহ বলেন, أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

(ঙ) দৃঢ়পদে সংগ্রাম করা : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا، ‘হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা শত্রুর মোকাবেলা কর, তখন দৃঢ় থাক’ *(আনফাল ৮/৪৫)*।

(চ) শক্তি অর্জন করা : আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ– ‘তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সাধ্যপক্ষে শক্তি সঞ্চয় কর, ঘোড়া ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে। এর দ্বারা তোমরা ভয় দেখাও আল্লাহ্‌র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের এবং তাদের বাইরে অন্যদের, যাদের তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদের জানেন। আর যা তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে, তা পুরোপুরি তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমরা আদৌ অত্যাচারিত হবেনা’ *(আনফাল ৮/৬০)*।

২. নৈতিক উপাদান সমূহ (الأسباب المعنوية) :

(ক) ধৈর্যশীলতা ও (খ) আল্লাহভীরুতা : আল্লাহ বলেন,

إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَـــذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ– ‘যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীরু থাক, তবে ওরা তোমাদের দিকে অতর্কিতে এগিয়ে এলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা’ *(আলে ইমরান ৩/১২৫)*।

(গ) দৃঢ়চিত্ততা : আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةُ، ‘নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয়’ *(হা-মীম সাজ্‌দাহ ৪১/৩০)*।

(ঘ) ঈমান ও (ঙ) সৎকর্মশীলতা : আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، 'আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যকার ঐ সব লোকদের যারা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে। তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করবেন' *(নূর ২৪/৫৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবে ইসলামী খেলাফত কায়েমের পিছনে উপরোক্ত দু'টি কারণ মওজুদ ছিল। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র মতে 'তৎকালীন আরবরা একটি বিজয়ী শক্তির গুণাবলীতে ভূষিত ছিল'। বস্তুগত উপাদানে তারা অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নৈতিকতার মান নীচু ছিল। তাদের মধ্যে বেঈমানী, চরিত্রহীনতা ও দলাদলি ছিল। কিন্তু এসব ত্রুটিগুলি পরে ইসলামের বরকতে বিদূরিত হয়ে গেলে তারা পরস্পরে সহযোগী হয়ে যায় *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

এইভাবে বস্তুগত ও নৈতিক উপাদানে বলীয়ান হওয়ার পরেই আল্লাহ পাক তাদের উপরে পুরস্কার অথবা পরীক্ষা স্বরূপ ইসলামী খেলাফত পরিচালনার গুরুভার ন্যস্ত করেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

উপরে বর্ণিত দু'টি উপাদান অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে বাড়তি আরেকটি কারণ ঐ সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সেটি হ'ল ঐ সময়ে জগতে নেতৃত্ব দানকারী শক্তিগুলি তাদের নৈতিক বল হারিয়ে ফেলেছিল এবং জনসাধারণ তাদের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়েছিল। সেকারণ মানুষ ইসলামী খেলাফতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৪৪]

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক ও বস্তুগত উভয়বিধ উপাদান অবশ্যই প্রয়োজন। বস্তুগত উপাদানে দু'টি শক্তি সমান হ'লে সে ক্ষেত্রে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান দলটিই জয়লাভ করবে। সূরা নূর-এর ৫৫ আয়াতে 'ঈমান' ও 'আমলে

---

৪৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ গোন্দলবী (১৮৯৭-১৯৮৫ খৃ., গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান) কৃত 'তানক্বীদুল মাসায়েল' বই; গৃহীত : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'তিনটি মতবাদ' বই, ৩য় সংস্করণ : মে ২০২০ খৃ.।

ছালেহ'-কে খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যারা মনে করেন শুধুমাত্র দো'আর মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকূমত কায়েম হয়ে যাবে অথবা যারা ভাবেন ক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই কেবল ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তারা উভয়ে ভুলের মধ্যে আছেন। বরং যে দেশে আমরা ইসলামী খেলাফত কায়েম করতে চাই, সে দেশের জনগণের মন-মানসিকতাকে আগে নির্ভেজাল ইসলামী ছাঁচে গড়ে নিতে হবে। ইসলামের প্রকৃত বুঝ হাছিল হয়ে গেলে তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামী খেলাফত হবে ইনশাআল্লাহ।

সংশয় নিরসন (إزالة الشبهة) :

'জিহাদ' বলতে অনেকে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝাতে চান। অথচ হাদীছে জান, মাল ও যবান দ্বারা জিহাদের কথা বলা হয়েছে।[৪৫] ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের প্রথম ১৩ বছর মক্কায় স্রেফ দাওয়াতের মধ্যেই কেটেছে। অতঃপর ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যখন কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনই মদীনায় বদর-ওহোদ ও খন্দকের সশস্ত্র জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। আজও যদি কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ইসলামী দেশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ 'ফরযে আয়েন' হবে। যেভাবে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, ইরাক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কুফরী শক্তিকে মোকাবেলা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্ত অবস্থায় দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালানো, বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহের উস্কানী দেওয়া এবং অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে।[৪৬] এ সময় শাসকদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করার নির্দেশ এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও পথভ্রষ্ট দাউস গোত্রের ও তাদের নেতার হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছেন *(বুখারী হা/৪৩৯২)*।

---

৪৫. جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ– আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১; মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, রাবী আনাস (রাঃ)।

৪৬. মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮, রাবী উম্মু সালামাহ (রাঃ)।

মনে রাখতে হবে যে, কুফরী শক্তি সর্বদা মীর জাফর ও কামাল পাশাদের ন্যায় কিছু মুনাফিককে গদিতে বসায় ও তাদের হাত দিয়েই তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। যাতে মুসলিমগণ তাদের মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে। এইসব মুসলিম বেশধারী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(তওবা ৯/৭৩; তাহরীম ৬৬/৯)* এবং রাসূল (ছাঃ) জান-মাল ও যবান দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫০৪ প্রভৃতি)*।

মুমিনের করণীয় (واجبات المؤمن) :

অমুসলিম বা ফাসেক মুসলিম উভয় সরকারের বিরুদ্ধে মুমিনের করণীয় হ’ল- (১) উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।[৪৭] (২) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কেননা আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ، ‘আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে’ *(রা‘দ ১৩/১১)*। (৩) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা।[৪৮] (৪) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো‘আ

---

৪৭. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ– ‘তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন অন্যায় হ’তে দেখে, তখন সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হ’লে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হ’লে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটা হ’ল দুর্বলতম ঈমান’ *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ))*। একই রাবী হ’তে বর্ণিত হয়েছে, أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ– ‘সর্বোত্তম জিহাদ হ’ল, যালেম শাসকের নিকট হক কথা বলা’ *(তিরমিযী হা/২১৭৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৭০৫)*।

৪৮. اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ، ثَلاَثًا. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ– ‘দ্বীন হ’ল নছীহত’। আমরা বললাম, কাদের জন্য হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য’ *(মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬ রাবী তামীম দারী (রাঃ))*।

করা।[৪৯] (৫) যালেম সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা।[৫০] কোন মুমিন কোন অবস্থাতেই কোন অমুসলিমকে বা নারীকে বা সেক্যুলার ব্যক্তিকে আমীর বা শাসক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ ঐসব শাসকরা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসন করেন না।

এভাবে সকল প্রকার বৈধ পন্থায় দেশে ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকা যাবে না।

॥ প্রথম ভাগ সমাপ্ত ॥

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

---

৪৯. যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে দাউস গোত্রের বিরুদ্ধে বদদো'আ করতে বলা হ'লে তিনি তাদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করে বলেন, –اَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনো'। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ক্বাস্তালানী বলেন, পরে দেখা গেল যে, অভিযোগকারী তুফায়েল বিন 'আমর ফিরে গিয়ে নিজ কওমকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাতে তাদের শাসকসহ ৭০-৮০টি পরিবার মুসলমান হন ও ৭ম হিজরীতে খায়বরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হন। যার মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা দাওসী (রাঃ)। =(*বুখারী হা/৬৩৯৭; মুসলিম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/৫৯৯৬ 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, অনুচ্ছেদ-১; বুখারী (দিল্লী ছাপা) টীকা-১১, ২/৬৩০ পৃ.)*।

৫০. বুখারী হা/১০০২; মুসলিম হা/৬৭৭; মিশকাত হা/১২৮৯ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৫; বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই 'মুমিনের করণীয়' অনুচ্ছেদ ৬১ পৃ.।

দ্বিতীয় ভাগ (الجزء الثانى)

নেতৃত্ব নির্বাচন (انتخاب الإمارة)

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা নেতার মাধ্যমে সমাজ ও দেশ চলে। নেতা ও তার সাথীরা অযোগ্য ও অত্যাচারী হ'লে সমাজে ও দেশে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেকারণ নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য ইসলাম মৌলিক নির্দেশনা সমূহ প্রদান করেছে। যেমন (১) নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। এর ফলে নেতৃত্ব লাভের ও দখলের প্রতিযোগিতা থাকবে না। (২) অল্পসংখ্যক বিচক্ষণ পরহেযগার ব্যক্তিগণের নিরপেক্ষ পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হবেন এবং অন্যেরা তা মেনে নিবেন। এর ফলে আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোকেরাই কেবল নেতা হবেন। (৩) যোগ্য থাকা অবধি খলীফা স্বপদে বহাল থাকবেন। এর ফলে নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি থাকবেনা। (৪) নেতা পুরুষ হবেন। এর ফলে নারীরা নিরাপদ থাকবেন।

বস্তুতঃ সমাজ জীবনে সকল প্রকার আমানতের মধ্যে নেতৃত্বের আমানত সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا- يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْآ إِلَى الطَّاغُوْتِ، وَقَدْ أُمِرُوْآ أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ، وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا-

'আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(৫৮)*। 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(৫৯)*। 'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা ধারণা করে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা তোমার উপর নাযিল হয়েছে তার উপর এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর। তারা ত্বাগূতের নিকট ফায়ছালা পেশ করতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার জন্য। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়' *(নিসা ৪/৫৮-৬০)*।

ব্যাখ্যা : সূরা নিসা-র উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব যথাযোগ্য স্থানে অর্পণ, নেতৃত্ব নির্বাচন ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং সকল বিবাদীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে সর্বাবস্থায় ত্বাগূত থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম উম্মাহকে আদেশ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে 'আমানাত' (اَلْأَمَانَاتِ) শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শুধু বস্তুগত কোন আমানত নয় বরং জীবন ও সমাজ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই যে দায়িত্ব ন্যস্ত হবে সবই আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। নিয়োগ ও বরখাস্তের মালিক সকল নেতা ও কর্মকর্তা উক্ত আমানতের যিম্মাদার। কাজেই উক্ত আমানত যেমন কোন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করা যাবে না, তেমনি প্রতিটি পদের জন্য সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তি তালাশ করা নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল : সমাজ পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য নেতা বাছাই করার পন্থা কি?

নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা সমূহ

(طرق انتخاب الإمارة)

নেতৃত্ব বাছাই বা নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য এযাবৎ চারটি পন্থা দেখা গেছে। যথা- অছিয়ত ভিত্তিক, পরামর্শ ভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক।

প্রথমোক্ত পন্থায় : পূর্বতন নেতা স্বীয় বিবেচনা মতে পরবর্তী নেতার নাম বলে যান বা অছিয়ত করেন, যা সকলে মেনে নেন।

দ্বিতীয় পন্থায় : পূর্বতন নেতা যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করেন ও তার ভিত্তিতে একজনকে নেতা নির্বাচন করে দেন। অথবা তিনি একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন করে দেন, যারা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের নিকট থেকে মতামত নেন ও তার ভিত্তিতে যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী নেতা নির্বাচন করেন।

তৃতীয় পন্থায় : রাজা স্বীয় সন্তানদের মধ্যে যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকে পরবর্তী 'রাজা' হিসাবে ঘোষণা করেন, যা সকলে মেনে নেন।

চতুর্থ পন্থায় : পূর্বতন নেতার কোন ভূমিকা থাকে না। বরং প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের অধিকাংশের ভোটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে একটি দল বা একজন নেতা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তবে বহুদলীয় গণতন্ত্রে সরাসরি নেতা নির্বাচিত হন না। বরং দলের মনোনীত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হন। পরে তারাই দলনেতাকে দেশের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করেন, যদি দলনেতা নিজে তার নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হ'তে পারেন। শেষোক্ত পন্থায় অনেকগুলি দল নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পরাজিত দল সমূহের প্রাপ্ত সম্মিলিত ভোট যদি বিজয়ী দলের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি তারা নেতা হ'তে পারেন না। বিজয়ী সংখ্যালঘু দলটির নেতাই দেশের নেতা হয়ে থাকেন। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই নিয়মে নেতৃত্ব নির্বাচন চলছে। শুধু দেশের নেতাই নন বরং স্থানীয় সংস্থা সমূহে এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসার কমিটি গঠনেও এই নিয়ম চালু হয়েছে। শেষোক্ত পন্থায় নেতা নির্বাচনের মূল দায়িত্ব থাকে ভোটারদের হাতে।

বর্তমান পৃথিবীতে নির্বাচন সমূহ

(الانتخابات في العالم الحالى)

(১) আমেরিকার নির্বাচন (الانتخاب فى أميريكا) :

সেখানে রয়েছে ডেমোক্রাট (গণতন্ত্রী) ও রিপাবলিকান (প্রজাতন্ত্রী) দ্বি-দলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনে ডেমোক্রাট (গণতন্ত্রী) দলের মার্কা হ'ল 'গাধা' এবং রিপাবলিকান (প্রজাতন্ত্রী) দলের মার্কা হ'ল 'হাতি'। নামে ও মার্কায় পার্থক্য হ'লেও এটি হ'ল পুঁজিপতিদের নেতৃত্বের লড়াই। যার প্রকৃতি উভয় দলে সমান। এখানকার প্রেসিডেন্টদের মেয়াদ ৪ বছর। যা প্রতি বছর ২০শে জানুয়ারী থেকে শুরু হয়।

২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার জনসংখ্যা ৩২ কোটি ৪৫ লাখ। সেদেশের ৫০টি রাজ্যে ৫০ রকম সংবিধান ও নির্বাচনী বিধি। এক রাজ্যে যা সিদ্ধ, অন্য রাজ্যে তা নিষিদ্ধ। ব্যালটে কেবল প্রেসিডেন্ট ভোটই থাকে না, আইনের বিষয় মতামতও দিতে হয়। এটি একটি ভুল প্রথা। কেননা সব ভোটার আইন বিষয়ে মতামত দেওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

আমেরিকায় ভোট দু'রকম : পপুলার ভোট ও ইলেক্টোরাল ভোট। শেষোক্ত ভোটাররা হ'লেন দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ। এঁরাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। যাদের মধ্যে থাকেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। যাদের সংখ্যা সারা দেশে নির্ধারিত মোট ৫৩৮ জন। তাদের মধ্যে যিনি অর্ধেক অর্থাৎ ২৭০ টি ভোট পাবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। আর সাধারণ নাগরিকদের ভোট হ'ল 'পপুলার' ভোট। তাতে কেউ বেশী পেলেও যায় আসে না। যেমন ২০১২ সালের ৬ই নভেম্বর রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশ-এর চাইতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রাট প্রার্থী আল-গোর পপুলার ভোট ১০ লাখ বেশী পেয়েছিলেন। কিন্তু ইলেক্টোরাল ভোট ৫টি কম পাওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্ট হ'তে পারেননি। ২০১৬ সালের ৮ই নভেম্বর ১৩ লক্ষাধিক পপুলার ভোটে বিজয়ী হয়েও ডেমোক্রাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ৫৮টি ইলেক্টোরাল (২৯০-২৩২) ভোটে হেরে পরাজিত হন এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতে যান।

এর মধ্যে একটা বিষয় শিক্ষণীয় যে, সেদেশে জ্ঞানী-গুণীদের ভোটের মূল্য আছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত ইলিশ মাছ ও পুঁটি মাছের দর এক নয়। তবে এই জ্ঞানী-গুণীরাও যে মারাত্মক ভুল করেন, তার প্রমাণ হ'ল রাজনীতিতে নবাগত, অদক্ষ ও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া ব্যবসায়ী আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে নিম্নস্তরের একজন ব্যক্তি ২০১৬ সালের নির্বাচনে সেদেশের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। এর কারণ হ'ল, তাদের কাছে নেতা বাছাইয়ের কোন শারঈ মানদণ্ড নেই।

(২) চীনের নির্বাচন (الانتخاب فى الصين) :

বলা হয়ে থাকে যে, ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে গরীব কৃষক পরিবারের সন্তান ও পরে স্কুল শিক্ষক মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট চীনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকেন। যাঁকে আধুনিক চীনের রূপকার বলা হয়।

২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি। এটি চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক একদলীয় শাসনের দেশ। এখানকার প্রেসিডেন্টদের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসাবে পার্টি কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম সম্মেলন হয়েছে ২০১৭ সালের ১৮ই অক্টোবর। সমগ্র চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সংখ্যা ২৩০০। এ সম্মেলনে বেশ গোপনীয়তার সাথে সমগ্র দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য ২০০ সদস্য নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পলিট ব্যুরো নির্বাচিত করে। এরপর পলিট ব্যুরো ৭ সদস্য বিশিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নির্বাচন করে। চীনের রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার জন্য এই স্ট্যান্ডিং কমিটিই হচ্ছে সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। যদিও নির্বাচনের কথা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। পলিট ব্যুরো কিংবা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কারা হবেন, সেটা আগেই বাছাই করে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি সেটি অনুমোদন করে মাত্র। স্ট্যান্ডিং কমিটির কর্মপদ্ধতি সবসময় গোপন থাকে। তবে ধারণা করা হয় স্ট্যান্ডিং কমিটি

প্রায়ই বৈঠকে বসে। সে বৈঠকে সিনিয়র নেতারা প্রথমে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের মতামত তুলে ধরেন। কোন একটি বিষয়ে সবাই যাতে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে সেজন্য জোর দেওয়া হয়। কিন্তু যদি সেটা না হয়, সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লে সবাই সেটি মানতে বাধ্য থাকে। বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় বিতর্ক এবং মতপার্থক্য হ'লেও সেগুলো জনসম্মুখে আসে না। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দলটির শীর্ষ নেতা অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। দলের সাধারণ সম্পাদকই দেশের প্রেসিডেন্ট হন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু পদের ক্ষেত্রে অলিখিত নিয়ম-কানূন নির্ধারণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে পলিট ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্য, যাদের বয়স ৬৮ বছরের বেশী হয়েছে, তারা হয়তো পদ ছেড়ে দিবেন।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০১২ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের চিন্তাধারাকে দলীয় গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

চীনের সংবিধান অনুযায়ী দেশটির প্রেসিডেন্ট পদে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় থাকতে পারেন। মেয়াদের সময়কাল পাঁচ বছর। সে হিসাবে বর্তমান প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হবে ২০২২ সালে। সেকারণ চীনে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ বিলুপ্ত করে একটি বিল পাস করেছে সে দেশের ক্ষমতাসীন 'ন্যাশনাল পিপলস পার্টি অব চায়না'। ওই বিল পাস হওয়ার ফলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার সুযোগ পাচ্ছেন। পিপলস পার্টির বার্ষিক সভায় নিরঙ্কুশ সমর্থন নিয়ে পাস হয় বিলটি। আধুনিক চীনের রূপকার মাও সে তুং-এর পর শি জিনপিং হ'লেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় তার চিন্তাধারা দলীয় গঠনতন্ত্রে মতাদর্শের মর্যাদা পায়। ফলে মাওয়ের মতবাদ যেমন 'মাও বাদ' হিসেবে বিবেচিত হয়, শি'র চিন্তাধারাও তেমনি 'শি বাদ' হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যেকোন চ্যালেঞ্জ এখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির

বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে বিবেচিত হবে। এই কঠোর ব্যবস্থার ফলেই বিশ্বের সেরা জনবহুল এই দেশটি নির্বাচনী সংঘাতমুক্ত ভাবে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। যদিও মুসলিম ও অন্যান্য ভিন্ন মতাবলম্বীরা সেখানে চরম নির্যাতনের শিকার।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (১৮ই আগস্ট ২০১৮ থেকে) চীনের ক্ষমতাসীন চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) প্রশাসনকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রশংসা করে বলেন, দলটি পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে একটি নতুন মডেল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সমাজে যোগ্যতাকে তুলে ধরেছে। তিনি বলেন, আজকের গণতন্ত্রগুলি শুধুমাত্র পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা করে। পক্ষান্তরে পশ্চিমা গণতন্ত্র ছাড়াই চীন উন্নতি করেছে। সে দেশের ক্ষমতাসীন দলের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে চীনা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি এ মন্তব্য করেন *(দৈনিক ইনকিলাব ৩.৭.২০২১ ইং)*।

(৩) যুক্তরাজ্যের সরকার ব্যবস্থা (نظام الحكومة فى بريطانيا) :

যুক্তরাজ্যের সরকার ব্যবস্থা হ'ল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ (জন্ম : ২১শে এপ্রিল ১৯২৬ খৃ.) রাষ্ট্রপ্রধান। যিনি ১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে অদ্যাবধি ক্ষমতায় আছেন।

ব্রিটেনের সব আইনে সই করেন রাণী। সরকার নিয়োগ ও বরখাস্তের মালিক তিনি। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে বরখাস্ত করার ক্ষমতাও রয়েছে রাণীর। কেননা ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া বৃটিশ শাসনভুক্ত ছিল। বর্তমানে রাণীর প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে একজন গবর্ণর জেনারেল অবস্থান করেন। রাণী ইংল্যাণ্ডের ধর্মেরও প্রধান। প্রসিকিউশনের ক্ষমতা নেই তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার। আর এ কারণেই তিনি বাস্তবে আর্থ কুইন বা বিশ্ব রাণী।

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বংশানুক্রমিক শাসন ও নীতির বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটেনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজতন্ত্র টিকে আছে। এ বিষয়ে ডব্লিউ. বি. মুনরো বলেন, 'ব্রিটেনের ইতিহাস অসংখ্য বিরোধপূর্ণ ধারণার

সমষ্টি। এদের মধ্যে এমন একটি ধারণা যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হ'ল, গণতন্ত্রের প্রসারের সাথে সাথে রাজ প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে'।

ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার প্রধান কারণ সমূহ নিম্নরূপ :

(১) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা। (২) গণতন্ত্র বিকাশে প্রতিবন্ধক না হওয়া। (৩) রাজা বা রাণীর রাজনীতি নিরপেক্ষতা। (৪) সাংবিধানিক সুবিধা। (৫) জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের উৎস। (৬) ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। (৭) রাজতন্ত্র কমনওয়েলথ দেশগুলোর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। (৮) রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা।

যুক্তরাজ্যে দ্বি-কক্ষীয় শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। বর্তমানে ব্রিটেনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের নিম্ন কক্ষের। যাকে 'হাউজ অফ কমন্স' বলা হয়। হাউজ অফ কমন্সের ৬৫০ জন সদস্য ৬ বছর মেয়াদের জন্য উন্মুক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা নির্বাচিত করেন। প্রধানমন্ত্রী আবার হাউজ অফ কমন্সের মধ্য থেকে তাঁর মন্ত্রীসভার জন্য সদস্য বাছাই করেন। প্রধানমন্ত্রী রাণীর নিকটে শপথ নেন। একইভাবে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিকটে পদত্যাগ পত্র জমা দেন।

(৪) জাপানের সরকার ব্যবস্থা (نظام الحكومة في اليابان) :

জাপান একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। এখানে সম্রাটের ক্ষমতা সীমিত এবং তার মেয়াদ আজীবন। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সংবিধান তাকে 'রাষ্ট্র ও জনগণের ঐক্যের প্রতীক' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানত প্রধানমন্ত্রী ও ডায়েটের হাতে ন্যস্ত। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সম্রাট দিয়ে থাকলেও সংসদের বেছে নেওয়া প্রার্থীর বাইরে অন্য কাউকে তিনি উক্ত পদে নিয়োগ দিতে পারেন না। জাপানের আইন বিভাগ হ'ল ন্যাশনাল ডায়েট। ডায়েট একটি দ্বি-কক্ষীয় আইনসভা। এক- হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স। যার সদস্য সংখ্যা ৪৮০। যাদের মেয়াদ ৪ বছর বা ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত। এই কক্ষের সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। দুই- হাউজ অফ কাউন্সিলর্স। যার সদস্য সংখ্যা ২৪২। যারা ৬ বছর মেয়াদে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। সর্বনিম্ন ২০ বছর বয়সের নাগরিকরা ভোট দিয়ে থাকেন।

(৫) ফ্রান্সের নির্বাচন (الانتخاب في فرنسا) :

ফ্রান্স একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতন্ত্র। এখানে ৫ বছর অন্তর জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ফ্রান্সের সরকার গঠনের নির্বাচন মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও অন্যটি আইন সভা নির্বাচন। প্রথমে দুই দফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফার নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট পান তবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পেলে দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দুইজন প্রার্থীর মধ্যে আবার ভোট হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হয় আইন সভার নির্বাচন। ফ্রান্সের আইন সভার সদস্য সংখ্যা ৫৭৭।

এইসব আসনের বিপরীতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধি বা ডেপুটি নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনও দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয়।... নির্বাচিত ডেপুটিদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন।

(৬) রাশিয়ার নির্বাচন (الانتخاب في روسيا) :

বলা হয়ে থাকে যে, ১ কোটি ১৭ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে রাশিয়ার ‘জার’ সম্রাটের পতনের পর সেখানে সমাজতন্ত্রের নামে ১৯১৭ সালে ‘বলশেভিকবাদ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর কমরেড লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) ও স্ট্যালিনের (১৮৭৮-১৯৫৩) কমিউনিস্ট পার্টির এক দলীয় লৌহ শাসন শেষে পুনরায় সেদেশে তাদের ছুঁড়ে ফেলা বুর্জোয়া নির্বাচনী রাজনীতি শুরু হয়েছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন ক্রেমলিনের প্রধান হন। অতঃপর ১৯৯৯ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এযাবৎ ক্ষমতায় আছেন। কখনো প্রেসিডেন্ট হিসাবে, কখনো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। আগে ছিল ৪ বছর মেয়াদী নির্বাচন। পরে হয় ৬ বছর মেয়াদী। আগামী ২০২৪ সালে তার বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে। ফলে চীনের ন্যায় সেখানেও পুতিনকে আজীবন প্রেসিডেন্ট করার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। ইতিমধ্যে তিনি যেকোন ধরনের অপরাধ থেকে সারা জীবনের জন্য

‘দায়মুক্তি’র বিল পাশ করে নিয়েছেন *(দৈনিক ইত্তেফাক ২৪.১২.২০২০)*। অতঃপর আরও দুই মেয়াদের জন্য অর্থাৎ আগামী ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি পার্লামেন্টে বিল পাশ করে নিয়েছেন *(দৈনিক ইনকিলাব ৭.৪.২০২১)*।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর সোভিয়েতের রুশীয় প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডারেশন হিসাবে গঠিত হয় এবং একক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। রাশিয়া একটি আধা-রাষ্ট্রপতি শাসিত দেশ, যেখানে প্রেসিডেন্ট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে থাকেন।[৫১]

(৭) সুইজারল্যাণ্ডের নির্বাচন (الانتخاب في سوئيزرلاند) :

১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশটি পৃথিবীর ধনী রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম। আয়তন ৪১,২৮৫ বর্গ কি.মি.। ২০১৬ সালের হিসাবে জনসংখ্যা ৮২ লাখ। মোট ২৬টি ক্যান্টন সমন্বয়ে এটি একটি কনফেডারেশন রাষ্ট্র। সরকারী ও প্রশাসনিক রাজধানী হ’ল বার্ণ (Bern)। যা তিন দিকে নদী বেষ্টিত একটি উঁচু শৈলান্তরীপের ওপর অবস্থিত। রাজধানী শহর ‘বার্ন’ হ’লেও সবচেয়ে পরিচিত শহর দু’টি হ’ল জুরিখ ও জেনেভা। জুরিখের দিকের লোকেরা জার্মান এবং জেনেভার দিকের লোকেরা ফরাসী। আল্পস পর্বতমালা ও প্রশস্ত হ্রদ সুইজারল্যাণ্ডকে অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে। বিশ্বের পর্যটকদের জন্য এটি বিশেষ আকর্ষণীয় দেশ। সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, ট্রেন এবং চকলেটের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। অবশ্য সুইস ব্যাংকসমূহ কালো টাকার নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য কুখ্যাত।

---

৫১. প্রবল পরাক্রান্ত কমিউনিস্ট একনায়ক ভ্লাদিমির লেনিন-এর শাসনকালে (১৯১৭-১৯২৪ খৃ.) তার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী রাখার জন্য রাজধানী মস্কোতে ৭২ টন ওযনের বিশাল পিতলের মূর্তি স্থাপন করা হয়। যা তার মৃত্যুর পর ১৯৯১ সালে তারই অনুসারীদের হাতে চূর্ণ হয়। একই বছরে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় সব স্থানে লেনিনের মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলা হয়। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ার দখল নিয়ে রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে ইউক্রেন সরকার ২০১৫ সালের মে মাসে সেদেশ থেকে লেনিনের ১৩২০টি মূর্তি এবং ১৬৯টি অন্যান্য স্মৃতিসৌধ নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় *(দৈনিক ইনকিলাব ২২.৮.২০১৭)*। এটিই হ’ল মূর্তির পরিণতি। ইসলাম সম্মানের উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য ছবি-মূর্তি হারাম করেছে। অতএব জ্ঞানীরা সাবধান!

সুইজারল্যাণ্ডে প্রতি চার বছর অন্তর পার্লামেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ১১০ জন সংসদ সদস্যের সরকার গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আধা-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেশটিতে চারটি রাজনৈতিক দল ঐক্যমতের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। সুইস সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবছর ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন হয়। চার দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য প্রতি এক বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। দেশটির কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই।

নির্বাচন সমূহ পর্যালোচনা (مراجعة الانتخابات) :

উপরে বর্ণিত বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির নির্বাচন পদ্ধতি (১) একেক দেশে একেক রূপ। যদিও প্রতিটি দেশই গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত। কিন্তু ইসলামী নির্বাচন পদ্ধতি সর্বদা একইরূপ। (২) সর্বত্র সার্বভৌমত্বের মালিক মানুষ। কিন্তু ইসলামী খেলাফতে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ *(আহযাব ৩৩/৩৬; নিসা ৪/৬৫)*। (৩) প্রতিটি দেশেই আইন রচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। কিন্তু ইসলামী খেলাফতে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। (৪) প্রতিটি সরকারই বস্তুবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ইসলামী খেলাফত ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত। (৫) প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতার জন্য একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি প্রবণতা লক্ষণীয়। যা মানুষের স্বভাব ধর্মের অনুকূলে। সেকারণ ইসলামী খেলাফতে আমীর যোগ্য থাকা অবধি নিজ দায়িত্বে বহাল থাকেন। (৬) সকল দেশে নেতৃত্ব চেয়ে নেবার বা আদায় করে নেবার মানসিকতা বিরাজমান। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ এবং এটিকে ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় আমানতের জওয়াবদিহিতার বিষয় হিসাবে কঠিনভাবে ভয় করা হয়।

ইসলামী নির্বাচন নীতি

(أصول الانتخاب الإسلامى)

(১) ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন হয় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সরাসরি পরামর্শের মাধ্যমে। যেমন মুমিনের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– 'যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, ছালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে এবং তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(শূরা ৪২/৩৮)*।

(২) ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَّسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا– 'তুমি নেতৃত্ব চেয়োনা। কেননা যদি তোমাকে সেটা চাওয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাহ'লে তোমাকে তার উপরেই সোপর্দ করা হবে (অর্থাৎ কোন সাহায্য করা হবেনা)। আর যদি তুমি না চেয়ে সেটা পাও, তাহ'লে তোমাকে সাহায্য করা হবে'।[৫২] তিনি বলেন, إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : مَنْ أَرَادَهُ– 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এই শাসনকার্যের দায়িত্ব কাউকে দেইনা, যে তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে বা তার আকাংখা করে'।[৫৩]

(৩) যোগ্য থাকা অবধি খলীফা স্বপদে বহাল থাকবেন। এর ফলে নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি থাকবেনা। ইসলামী খেলাফতের দীর্ঘ ইতিহাস এর বাস্তব প্রমাণ।

(৪) নেতা পুরুষ হবেন। এর ফলে নারীরা নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً– 'ঐ জাতি

---

৫২. বুখারী হা/৭১৪৬; মুসলিম হা/১৬৫২ (১৩); মিশকাত হা/৩৬৮০ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮, রাবী আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাঃ)।

৫৩. মুসলিম হা/১৭৩৩; বুখারী হা/৭১৪৯; মিশকাত হা/৩৬৮৩ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮, রাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)।

কখনোই সফলকাম হবেনা, যারা নারীকে তাদের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে' *(বুখারী হা/৪৪২৫; মিশকাত হা/৩৬৯৩)*।

নেতৃত্বের গুরুত্ব (أهمية الإمارة)

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। নেতৃত্ব ব্যতীত সমাজ এক পা চলতে পারে না। এমনকি আকাশের পাখি, পানির মাছ ও জঙ্গলের পশুরাও নেতা মেনে চলে। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নে'মত হ'ল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও গুণ-ক্ষমতা সীমিত সংখ্যক লোকদের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। বাকীরা তাদের অনুসরণ করেন। তবে নবী ব্যতীত অন্য নেতাদেরকে আল্লাহ সরাসরি নিয়োগ করেন না। বরং বান্দাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য। যদিও নেতা আল্লাহ প্রদত্ত গুণ ও যোগ্যতা বলে অন্যদের থেকে স্পষ্ট হয়ে যান। তবুও নেতৃত্ব যেহেতু চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়, সেহেতু অন্যদেরকেই তা বাছাই করে অর্পণ করতে হয়।

নেতৃত্ব নির্বাচনের গুরুত্ব ইসলামে সবচাইতে বেশী। আর সেজন্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ক্ষমতা রাখে যে, সে ঘুমাবে না বা সকালে উঠবে না এ অবস্থায় ব্যতীত যে, তার একজন নেতা আছেন, তবে সে যেন সেটা করে'।[৫৪] সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর দাফনের পূর্বেই মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খলীফা নির্বাচন করা। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যুর সময় এটাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ওমর ফারূক (রাঃ) যখমে কাতর অবস্থায় এটাকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অতএব নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি কোন হালকা বিষয় নয় যে, যার-তার হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর তার পিছনে একটি জামা'আত কায়েম হবে। এই জামা'আত তার নেতার প্রতি আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের বায়'আত নিবে। তারা সর্বদা তার প্রতি আনুগত্যশীল ও ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যে জামা'আত তার নেতার প্রতি যত বেশী শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, সে জামা'আত তত বেশী শক্তিশালী ও সংহত।

---

৫৪. مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَّ يَنَامَ نَوْماً وَلاَ يُصْبِحَ صَبَاحًا إِلاَّ وَعَلَيْهِ إِمَامٌ فَلْيَفْعَلْ– ইবনু 'আসাকির ৩৬/৩৯৬; আহমাদ হা/১১২৬৫ রাবী বিশর বিন হারব (রাঃ)। হাদীছটির সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর দাফনের পূর্বেই দ্রুত খলীফা নির্বাচনের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় *(বুখারী হা/৬৮৩০; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'খলীফা নির্বাচন' অনুচ্ছেদ ৭৪৭ পৃ.)*।

নেতৃত্বের গুরুত্ব গাড়ীর ড্রাইভারের মত বা বিমানের পাইলটের মত। যাকে একই সঙ্গে যেমন যোগ্য ও সদা-সতর্ক থাকতে হয়, তেমনি সর্বতোভাবে যিম্মাদার হ'তে হয়। যে সমাজে ও সংগঠনে যত যোগ্য নেতা ও কর্মীর সমাবেশ ঘটবে, সে সমাজ ও সংগঠন তত দ্রুত অগ্রগতি লাভ করবে।

(১) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

يَجِبُ أَنْ يُّعْرَفَ أَنَّ وِلاَيَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لاَ قِيَامَ لِلدِّيْنِ وَلاَ لِلدُّنْيَا إِلاَّ بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لاَ تَتِمُّ مَصْلَحَتَهُمْ إِلاَّ بِالْإِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَلاَ بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ- وَقَالَ : لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ- فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الْإِجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِجْتِمَاعِ-

'এটি জেনে রাখা ওয়াজিব যে, লোকদের জন্য নেতা নির্বাচন করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং নেতৃত্ব ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা মানব সম্প্রদায় তাদের পরস্পরের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করতে পারে না সমাজ ব্যতীত। আর সমাজের জন্য অবশ্যই একজন নেতা অপরিহার্য। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন যেন তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে' *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮)*। তিনি আরও বলেন, 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নিযুক্ত না করা পর্যন্ত' *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*। সফরের সাময়িক ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতকে তাকীদ দিয়েছেন'।[৫৫]

---

৫৫. তাক্বিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (মদীনা মুনাউওয়ারাহ, মুজাম্মা' ফাহ্দ ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ. ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত, শামেলাহ ৩৫ খণ্ড; সংকলক : আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ নাজদী ১-৩৫ খণ্ড, الفهارس العامة সাধারণ সূচী সমূহ ৩৬-৩৭ খণ্ড, প্রণেতা : ঐ, পুত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান) মুদ্রণ : কায়রো ১৪০৪ হি., মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬,৯৭৯+৯৮২=১৭,৯৬১) ২৮/৩৯০ পৃ.।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ– 'যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হবে, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর (অর্থাৎ ধ্বংসের অপেক্ষা কর)।[৫৬]

(৩) তিনি বলেন, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'সাবধান! ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার কোমরের পিছনে তার প্রতারণার মাত্রা অনুযায়ী উঁচু একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। সাবধান! জনগণের নেতা হয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর নেই'।[৫৭]

শ্রেষ্ঠ নেতা ও তার পুরস্কার (خيار الأئمة وجزاءه) :

(১) শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ... 'সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক'...।[৫৮]

(২) তিনি বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا– 'আল্লাহ্‌র নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান হাত।

---

৫৬. বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়-২৭, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৫৭. মুসলিম হা/১৭৩৮ (১৫-১৬); মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৫৮. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(ঐ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে ন্যায়নিষ্ঠ'।[৫৯]

(৩) তিনি আরও বলেন, خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، 'তোমাদের মধ্যে ঐ নেতারাই শ্রেষ্ঠ, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারা তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দো'আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দো'আ করে। আর তোমাদের মধ্যে ঐ নেতা সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে'।[৬০]

(৪) তিনি বলেন, وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ– 'নেতা হ'লেন ঢাল স্বরূপ। যাঁর পিছনে থেকে লড়াই করা হয় ও যাঁর মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা হয়। যদি নেতা আল্লাহভীতির নির্দেশ দেন ও ন্যায়বিচার করেন, তাহ'লে এর জন্য তিনি পুরস্কার পাবেন। আর যদি বিপরীত কিছু বলেন, তাহ'লে তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে'।[৬১]

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ– وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ– 'শাসক যখন জনগণের ছিদ্রান্বেষণ করবে, তখন সে লোকদের ধ্বংস করবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যখন তুমি লোকদের গোপন বিষয় সমূহের পিছে পড়বে,

৫৯. মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)।
৬০. মুসলিম হা/১৮৫৫ (৬৫-৬৬); মিশকাত হা/৩৬৭০, রাবী 'আওফ বিন মালেক আল-আশজা'ঈ (রাঃ)।
৬১. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫ (৩২); মিশকাত হা/৩৬৬১ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২২৫-২৬ পৃ., রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তখন তুমি তাদেরকে ধ্বংস করবে'।[৬২] এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ শাসকরা কখনো জনগণের গোপন বিষয় সমূহের পিছে ছুটবে না। বর্তমান ডিজিটাল যুগে বিষয়টি লক্ষণীয়।[৬৩]

(৬) তিনি বলেন,

مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، اِحْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ- وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ : مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ- 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমানদের কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তাদের প্রয়োজনে, চাহিদায় ও অভাব-অভিযোগের সময় অদৃশ্য থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ থেকে অদৃশ্য থাকবেন' (অর্থাৎ তা পূরণ করবেন না -*আবুদাঊদ*)। তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, কোন নেতা বা শাসক যদি জনগণের দারিদ্র্য, অভাব ও প্রয়োজন থেকে নিজের দরজাকে বন্ধ রাখে, তাহ'লে আল্লাহ তার দারিদ্র্য, অভাব ও প্রয়োজন থেকে আসমানের দরজা সমূহ বন্ধ রাখবেন (অর্থাৎ আল্লাহ তার থেকে স্বীয় রহমতের দরজা বন্ধ রাখবেন)। এ হাদীছ শ্রবণের পর মু'আবিয়া (রাঃ) জনগণের কথা শোনার জন্য পৃথকভাবে একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন'।[৬৪]

---

৬২. আবুদাঊদ হা/৪৮৮৯; মিশকাত হা/৩৭০৮ রাবী আবু উমামাহ (রাঃ); আবুদাঊদ হা/৪৮৮৮; বায়হাক্বী শো'আব হা/৯৬৫৯; মিশকাত হা/৩৭০৯, রাবী মু'আবিয়া (রাঃ)।

৬৩. বাংলাদেশে বিগত সরকার সমূহের ৫৭ ধারা, ১৪৪ ধারা, ১৫৭ ধারা; অতঃপর বর্তমান সরকারের (২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর থেকে) আইসিটি আইন-২০১৩, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা-২০২০ প্রভৃতি বিধান সমূহ জনগণের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। কেউ কারু বই পড়ে বা বক্তব্য শুনে কোন অন্যায় করলে লেখক বা বক্তাকে উদ্বুদ্ধকারী হিসাবে দায়ী করে মামলা দেওয়া হচ্ছে ও রিম্যাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। ফলে মানুষ এখন হক কথা বলতে ভয় পাচ্ছে এবং সর্বদা আতংকে দিন কাটাচ্ছে।

৬৪. আবুদাঊদ হা/২৯৪৮; তিরমিযী হা/১৩৩২; মিশকাত হা/৩৭২৮, রাবী 'আমর বিন মুর্রাহ (রাঃ)।

নেতৃত্বের গুণাবলী

(صفات الإمارة)

নেতৃত্বের প্রধান গুণাবলী ৬টি : সাহসিকতা, দায়িত্বানুভূতি, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, আমানতদারী ও কর্মী পরিচর্যা।

১. সাহসিকতা : যা দু'ধরনের। (ক) আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল থাকার সাহসিকতা : যেমন হিজরতকালে ছওর গিরিগুহার মুখে শত্রুদের পদচারণা দেখে ভীত-চকিত সাথী আবুবকরকে সাহস দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا، 'চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৯/৪০)*। একইভাবে ফেরাঊন বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ভীত বনু ইস্রাঈলদের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) বলেছিলেন, كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ– 'কখনোই না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন। অবশ্যই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন' *(শো'আরা ২৬/৬২)*।

(খ) হক-এর উপর দৃঢ় থেকে বাতিলের মোকাবেলা করার সাহসিকতা : যেমন হোনায়েন যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে একাই রাসূল (ছাঃ) শত্রুদের উদ্দেশ্যে ধমক দিয়ে বলে ওঠেন,

أَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি নবী। মিথ্যা নই'। 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের সন্তান'।[৬৫]

অর্থাৎ যিনি বাতিলের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে স্রেফ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে যান, তিনিই নেতা হওয়ার সর্বাধিক হকদার বলে বিবেচিত হবেন।

২. দায়িত্বানুভূতি : (ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ

৬৫. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৯৫ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১; হা/৫৮৮৯ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১।

رَّعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে (ক্বিয়ামতের দিন) স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর (১) নেতা, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। (২) পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৩) স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও তার সন্তানদের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৪) গোলাম তার মনিবের ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৬৬] সুতরাং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত ও তীব্র দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল নেতা নির্বাচিত হবেন।

৩. দূরদর্শিতা :

নেতৃত্বের জন্য এটি একটি অপরিহার্য গুণ। যেমন (ক) ফিলিস্তীনে ক্ষমতাসীন আমালেক্বা সম্রাট জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার পথে বনু ইস্রাঈল সেনাপতি তালূত স্বীয় তৃষ্ণার্ত সেনাবাহিনীকে নদী পার হওয়ার সময় এক অঞ্জলীর বেশী পানি পান না করার নির্দেশ দেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাদের যুদ্ধে অবিচল থাকার পরীক্ষা নেন *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। অতঃপর ইস্রাঈলী বর্ণনা মতে ৮০ হাযার সৈন্যের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০০-এর কিছু অধিক সেনাদের হাতে বরং বলতে গেলে একা কিশোর বালক দাঊদের গুলতি দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র প্রস্তর খণ্ডের আঘাতেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট জালূত নিহত হন এবং যুদ্ধে বনু ইস্রাঈল বিজয়ী হয়।[৬৭]

---

৬৬. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।

৬৭. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত নবীদের কাহিনী-২ বই 'জালূত ও তালূতের কাহিনী এবং দাঊদের বীরত্ব' অনুচ্ছেদ।

আল্লাহ বলেন, كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ– 'কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে আল্লাহ্র হুকুমে। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*।

জর্ডান ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী উক্ত নদীটি 'শরী'আতের নদী' (نَهْرُ الشَّرِيْعَةِ) নামে প্রসিদ্ধ *(ইবনু কাছীর)*। তালূতের সাথী সবাইকে এখানে ঈমানদার বলা হ'লেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল অতি অল্পসংখ্যক লোক। উক্ত ঘটনায় তালূতের কর্মী বাছাইয়ের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগ্য নেতারা এভাবেই যোগ্য কর্মী বাছাই করেন। এগুলি ভোটের মাধ্যমে হয়না।

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلاَثَةٌ : صَاحِبُ يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَّنْفَعَنَا، وَصَاحِبَةُ مُوْسَى حِيْنَ قَالَتْ يَآ أَبتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِيْنُ، وَأَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ، حِيْنَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ–

'সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন। (১) শিশু ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের আযীয (রাজস্ব মন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'একে সম্মানের সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে' (২) মূসার স্ত্রী, যখন (বিবাহের পূর্বে) তিনি স্বীয় পিতা শো'আয়েব (আঃ)-কে বলেছিলেন, 'হে পিতা! এঁকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ'তে পারেন, যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' এবং (৩) আবুবকর ছিদ্দীক, যখন তিনি ওমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন'।[৬৮]

অতএব নেতা নির্বাচনের সময় ব্যক্তির দূরদর্শিতা ও যোগ্যতার প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দিতে হবে।

৪. প্রজ্ঞা : এর অর্থ গভীর জ্ঞান ও রায় দানের ক্ষমতা। যেমন একটি মামলার রায় দানের বিষয়ে পিতা দাঊদ (আঃ)-এর উপরে পুত্র

---

৬৮. হাকেম হা/৩৩২০, ২/৩৭৬ পৃ. সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৮ পৃ.।

সুলায়মানের রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا، 'আর (স্মরণ কর) দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল একটি শস্য ক্ষেত সম্পর্কে। যাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কওমের মেষপাল। আর আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার' *(৭৮)*। 'অতঃপর আমরা সুলায়মানকে সে বিষয়ে মীমাংসার বুঝ প্রদান করলাম। বস্তুতঃ আমরা তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান' *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

(ক) একটি আঙ্গুরের বাগিচা প্রতিবেশীর বকরীপাল নষ্ট করে দিয়েছিল। দাঊদ (আঃ) ফায়ছালা দেন যে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বকরীগুলি বাগানের মালিক পাবে। উক্ত ফায়ছালা শুনে পুত্র সুলায়মান পিতাকে নতুন একটি ফায়ছালার প্রস্তাব দেন যে, প্রথমতঃ বকরীগুলি বাগানের মালিককে দেওয়া হৌক। সে ওগুলো লালন-পালন করবে ও তার দুধ পান করবে এবং তার থেকে ফায়েদা উঠাবে। অন্যদিকে বকরীর মালিক বাগান পরিচর্যা করবে। অতঃপর এক বছর পরে সেগুলি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে তা বাগানের মালিককে অর্পণ করা হবে এবং বাগান মালিক বকরীগুলিকে তার মালিককে ফিরিয়ে দিবে। দাঊদ (আঃ) এটি পসন্দ করলেন এবং আগের রায় বাতিল করে নতুন ভাবে ফায়ছালা দিলেন। ইবনু মাসঊদ, মুজাহিদ প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন *(তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(খ) অনুরূপ কাছাকাছি আরেকটি ঘটনা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, দু'জন মহিলার নিকট তাদের দু'টি সন্তান ছিল। এমন সময় নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে ধরে নিয়ে যায়। তখন বাকী সন্তানটিকে দু'জনেই নিজের বলে দাবী করে। অতঃপর তারা দাঊদ (আঃ)-এর নিকট বিচার নিয়ে যায়। তিনি বড় জনের পক্ষে রায় দেন। অতঃপর তারা বেরিয়ে গেলে সুলায়মান তাদেরকে ডাকেন। অতঃপর বলেন, ছুরি নিয়ে এসো। আমি বাচ্চাটিকে দু'টুকরা করে দু'জনকে ভাগ করে দেব। একথা শুনে ছোটজন বলল, আল্লাহ আপনার উপর রহম

করুন! ওটি বড় জনের সন্তান। আপনি ওকে দু'টুকরা করবেন না। অতঃপর তিনি সন্তানটি ছোট জনকে দিয়ে দিলেন।[৬৯]

উল্লেখ্য যে, নবীগণ সকলে মা'ছূম অর্থাৎ নিষ্পাপ। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। এখানে দাঊদ (আঃ)-কে আল্লাহ সুলায়মানের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। যখন তিনি নবী হননি। অতএব নেতা সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকবেন এবং সর্বোচ্চ বিচক্ষণতার সাথে নিরপেক্ষ রায় দিবেন। এতে তিনি আল্লাহ্র সাহায্য পাবেন।

আর প্রজ্ঞা লাভের জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হয়। কেননা অনেক সময় কেবল পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। বরং ব্যক্তির পূর্বাপর কর্ম এবং আনুসঙ্গিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নেতাকে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমনভাবে নিয়েছিলেন ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যাকাত জমা দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৫ হিজরীতে পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে কাদেসিয়ার যুদ্ধ চলা অবস্থায় অসুস্থ সেনাপতি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) মদ্যপানের দণ্ডপ্রাপ্ত আবু মেহজানকে তার আবেদনক্রমে বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে। সেদিন সে তার প্রধান সেনাপতির ঘোড়া ও তরবারি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর তার ওয়াদা মত সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে বন্দীশালায় প্রবেশ করে। এ কারণেই পিতা ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন,- رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে প্রজ্ঞা দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(শো'আরা ২৬/৮৩)*।

৫. আমানতদারী :

সর্বোচ্চ আমানতদার ব্যক্তিই মাত্র নেতা হবেন।

(ক) আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

৬৯. বুখারী হা/৩৪২৭; মুসলিম হা/১৭২০; মিশকাত হা/৫৭১৯ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-৩; তাফসীর ইবনু কাছীর।

সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমরা তোমাদের পরস্পরের আমানতে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোলাম মিদ'আম খায়বর যুদ্ধে নিহত হ'লে লোকেরা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ সহ দো'আ করতে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বলেন, كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، 'কখনোই না। যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, খায়বার যুদ্ধের দিন গণীমত বণ্টনের পূর্বেই সে যে চাদরটি নিয়েছিল, সেটি তার উপরে অবশ্যই আগুন হয়ে জ্বলবে'।[৭০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গণীমতের মালের (আনুমানিক দুই দিরহাম মূল্যের) তুচ্ছ বস্তুর খেয়ানতকারী এবং আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়েননি বরং অন্যকে পড়তে বলেছেন।[৭১]

অতএব দায়িত্বের আমানত ও আর্থিক আমানতকে যিনি জাহান্নামের টুকরার ন্যায় সবচেয়ে বেশী ভয় করেন, কেবল তিনিই নেতা হ'তে পারেন। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে তার জান্নাত ও জাহান্নাম।

৬. কর্মী পরিচর্যা :

সর্বদা কর্মী পরিচর্যা করা ও তাদের খোঁজ-খবর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন- (ক) আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেইসব মুমিনদের প্রতি তুমি বিনয়ী হও' *(শো'আরা ২৬/২১৫)*।

(খ) প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে মুশরিকদের কিছু লোক ঠাট্টা করে বলে, قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ 'তোমাদের নবী

---

৭০. বুখারী হা/৬৭০৭; মুসলিম হা/১১৫; মিশকাত হা/৩৯৯৭ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, 'গণীমত বণ্টন ও তাতে খেয়ানত' অনুচ্ছেদ-৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৭১. আহমাদ হা/১৭০৭২; আবুদাঊদ হা/২৭১০; ইবনু মাজাহ হা/২৮৪৮; মিশকাত হা/৪০১১; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ৪৪ পৃ.; মুসলিম হা/৯৭৮ 'জানায়েয' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৩৭; বুলূগুল মারাম হা/৫৪২।

তোমাদের সবকিছু বিষয়ে এমনকি পেশাব-পায়খানার মত তুচ্ছ বিষয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলামুখী হ'তে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, তিনটির কমে ঢেলা না নিতে এবং শুকনা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন'।[৭২] অন্য বর্ণনায় কয়লার কথা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।[৭৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা টয়লেটের মধ্যে হ'লে ক্বিবলামুখী হওয়া জায়েয আছে।[৭৪] উল্লেখ্য যে, পানি পেলে কুলূখের প্রয়োজন নেই।[৭৫] কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই।[৭৬] কুলূখের জন্য তিন বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[৭৭]

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঈমানের সত্তুরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্ট দূর করা। আর লজ্জাশীলতা হ'ল ঈমানের অন্যতম শাখা'।[৭৮]

রাস্তা থেকে কাঁটা সরানোর বিষয়টি খুবই ছোট্ট কাজ। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে সচেতন মুমিনের পরিচয়। ধরুন রাস্তায় একজন পথচারী হঠাৎ বিপদে পড়ে গেছেন। আপনি কি তখন তার উদ্ধারে এগিয়ে যাবেন, নাকি মোবাইলে ছবি তোলায় ব্যস্ত হবেন। রাস্তায় একটি মরা কুকুর পড়ে আছে। সবাই নাকে কাপড় দিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি সেটাকে ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিবেন অথবা রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করে মাটি চাপা দিবেন। রাস্তার ধারে পানির ট্যাপ খোলা আছে। সমানে পানির অপচয় হচ্ছে। আপনি ছুটে গিয়ে ট্যাপটি বন্ধ করে দিবেন বা কাউকে দিয়ে করাবেন। এসব ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে কর্মী যাচাই হয়। তাছাড়া ছোট ছোট কাজ দিয়ে কর্মী পরিচর্যা করা আবশ্যক।

---

৭২. মুসলিম হা/২৬২; আহমাদ হা/২৩৭৭০; মিশকাত হা/৩৩৬।
৭৩. বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪; মিশকাত হা/৩৩৪।
৭৪. বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫; আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩।
৭৫. তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২ পৃ.।
৭৬. আবুদাঊদ হা/৪০; নাসাঈ হা/৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৪৯; মির'আত ২/৫৮ পৃ.।
৭৭. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৩৬; وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ– বুখারী হা/১৬১; মুসলিম হা/২৩৭; মিশকাত হা/৩৪১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২।
৭৮. মুসলিম হা/৩৫ (৫৭-৫৮); বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৮; মিশকাত হা/৫।

আর লজ্জাশীলতার গুণ না থাকলে এবং বড়-ছোট তারতম্যের জ্ঞান না থাকলে সমাজ, সংসার ও সংগঠনে শৃংখলা বলে কিছুই থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ– 'যখন তোমার লজ্জা থাকে না, তখন তুমি যা খুশী তাই কর'।[৭৯]

(ঘ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, (১) আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে। (২) আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হ'ল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। (৩) আমার কোন ভাইয়ের সাহায্যের জন্য তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকটে এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ই'তেকাফ করার চাইতে প্রিয়। (৪) যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলছিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় রাখবেন। (৬) সিরকা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, মন্দ আচরণ তেমনি মানুষের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দেয়' *(ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩)*।

উপরোক্ত হাদীছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণের ছোট-খাট বিষয়েও মুমিনকে সজাগ থাকতে হবে। অনেকের জ্ঞান আছে, কিন্তু হুঁশ নেই। যেমন আপনি ঘর খালি করে বেরিয়ে গেলেন। অথচ লাইট-ফ্যান অফ করলেন না। আপনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। অথচ মশারী ঠিক করলেন না। আপনি খানা খেলেন। কিন্তু প্লেট চাটলেন না বা ধুলেন না। আপনি টয়লেট করলেন। অথচ ভাল করে ছাফ করলেন না। আপনি

৭৯. বুখারী হা/৬১২০; মিশকাত হা/৫০৭২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১ রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

আদৌ হুঁশিয়ার ব্যক্তি নন। এই ধরনের ব্যক্তিদের অসতর্কতার জন্যই সংগঠনে ও সমাজে বেশী বিশৃংখলা ও ক্ষতি হয়। অতএব মুমিনদের নেতা হবেন সবার চেয়ে হুঁশিয়ার ও সদা সতর্ক। তাঁর চোখ ও কান থাকবে চারটি করে। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে সমাজ ও সংগঠনের স্বার্থ ও মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নেতৃত্ব নির্বাচন ফরযে কেফায়াহ (انتخاب الإمارة فرض كفاية) :

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন 'ফরযে কেফায়াহ'। উম্মতের দায়িত্বশীল কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি যখন পূর্বতন নেতার পরে সৎ ও যোগ্য কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন সকলের পক্ষ থেকে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যায় এবং সকলকে তা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। এটা 'ফরযে আয়েন' নয় যে, উম্মতের প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নর-নারীকে এ ব্যাপারে মতামত দিতেই হবে। বস্তুতঃ নেতৃত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। নইলে নাবিকহীন নৌকার ন্যায় নেতাহীন সমাজ ও সংগঠন দ্রুত বিশৃংখল ও বিনষ্ট হবে।

নির্বাচক কে হবেন? (من هو الأحق بالانتخاب؟) :

নেতৃত্ব নির্বাচনের মত ফরয হক আদায়ের কঠিন দায়িত্ব ইসলাম গুণী-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের উপরে ন্যস্ত করেনি। বরং দায়িত্বের প্রধান হকদার ও যিম্মাদার হ'লেন পূর্বতন নেতা। যিনি এযাবত নেতৃত্বের বোঝা বহন করে এসেছেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে উম্মতের কল্যাণ চিন্তা করে তিনি যাকে মনস্থ করবেন, তিনিই নেতা হবেন। ইবনু হযম (রহঃ) এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(কিতাবুল ফিছাল ৩/৯৭ পৃ.)*। আবুবকর (রাঃ) এটাই করেছিলেন। ওমর (রাঃ) সমমান সম্পন্ন ৬ জনের মধ্যে একজনকে খলীফা নির্বাচন করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন

(انتخاب الخلفاء الراشدين)

(১) আবুবকর (রাঃ)-এর নির্বাচন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। যা তাঁর দাফনের পূর্বেই ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ছাহাবীগণের বায়'আতের মাধ্যমে কার্যকর হয়।[৮০] উক্ত নির্বাচনে মক্কার মুহাজিরীন এবং মদীনার আউস ও খাযরাজ দুই প্রধান গোত্রের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। যাদের সর্বসম্মত সমর্থনে আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন।

(২) ওমর (রাঃ)-এর নির্বাচন :

হযরত আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে খলীফা হিসাবে মনোনীত করেন। যা শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণের সমর্থনে কার্যকর হয়।

(৩) ওছমান (রাঃ)-এর নির্বাচন :

'আশারায়ে মুবাশশারাহ্‌র ৬ জন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছাহাবীকে দিয়ে ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি 'খলীফা প্যানেল' মনোনয়ন দিয়ে যান। যারা তাঁর নির্দেশনা মতে তিন দিনের মধ্যে ওছমান (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করেন। তাঁরা ছিলেন ওছমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ এবং সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)*। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

ইবনু ইসহাক ইমাম যুহরী থেকে এবং যুহরী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, একদিন আমি ওমর (রাঃ)-কে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না কাকে আমি খেলাফতের এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করব। আমি একবার দাঁড়াচ্ছি একবার বসছি। তখন আমি তাঁকে বললাম, আলী সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে কি? তিনি বললেন, তাঁর যোগ্যতা আছে। কিন্তু তিনি হালকা মেযাজের মানুষ। তবে তাঁর উপরে খেলাফতের ভার অর্পণ করলে আমি মনে করি যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে চালাতে সক্ষম হবেন। আমি বললাম,

---

৮০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'খলীফা নির্বাচন' অনুচ্ছেদ ৭৪৭-৭৫২ পৃ.।

ওছমান সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, যদি আমি এটা করি তাহ'লে ইবনু আবী মু'আইত্ব লোকদের ঘাড় মটকাবে। লোকেরা তখন তার দিকে না তাকিয়ে ওছমানকেই হত্যা করবে (অর্থাৎ ওছমানের নিকটাত্মীয় অলীদ বিন ওক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব সবকিছু করবে। অথচ দোষ চাপানো হবে ওছমানের উপর)।[৮১]

আমি বললাম, ত্বালহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তিনি একটু আত্মম্ভরী মেযাজের মানুষ। এটা জানা সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব তার উপরে চাপানোটা আল্লাহ পসন্দ করবেন না। আমি বললাম যুবায়ের সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, উনি একজন বীরপুরুষ। কিন্তু উনি তো মদীনার বাজারে ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি কিভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে নযর দিবেন? আমি বললাম, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্ক্বাছ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, উনি দ্রুত রেগে ওঠেন। ওনার বিরুদ্ধে লড়াই হ'তে পারে। বললাম, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কতই না সুন্দর মানুষটির কথা তুমি বললে! কিন্তু উনি বড়ই দুর্বল। আল্লাহ্র কসম! হে আব্দুল্লাহ! এই নেতৃত্বের জন্য এমন একজন ব্যক্তি প্রয়োজন, যিনি শক্তিশালী কিন্তু অত্যাচারী নন। যিনি নম্র কিন্তু দুর্বল নন। যিনি হিসেবী কিন্তু কৃপণ নন। যিনি দাতা কিন্তু অপচয়কারী নন' *(আল-আহকামুস সুলত্বা-নিইয়াহ ১৪ পৃ.)*।

অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) বাকী পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনারা নেতৃত্বকে তিনজনের মধ্যে সীমিত করে নিন। তখন যুবায়ের স্বীয় নেতৃত্বকে আলীর উপরে, ত্বালহা ওছমানের উপরে এবং সা'দ আব্দুর রহমান বিন 'আওফের উপরে ন্যস্ত করলেন। এক্ষণে বিষয়টি তিনজনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। তখন আব্দুর রহমান বিন 'আওফ, হযরত আলী ও ওছমান-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে যিনি নেতৃত্ব থেকে সরে যাবেন, আমরা এটা তাঁর উপরেই ন্যস্ত করব। আল্লাহ তার উপরে সাক্ষী থাকবেন। এতে কেউ

৮১. আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আল-বাছরী আল-মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হি.), আল-আহকামুস সুলত্বা-নিইয়াহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২৭) ১৩ পৃ.।

কোন জবাব দিলেন না। তখন আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ) বললেন, আপনারা কি নেতৃত্ব আমার উপরে ন্যস্ত করতে চান? অথচ এটা থেকে আমি নিজেকে বের করে নিয়েছি। আল্লাহ আমার উপরে সাক্ষী আছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে বাছাই করতে কার্পণ্য করব না। তখন তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ (এতে আমরা রাযী)।[৮২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আপনারা চাইলে আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করতে পারি। তখন তাঁরা তাঁকে এখতিয়ার দেন।[৮৩] এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি বাদে আপনি কাকে খেলাফতের যোগ্য মনে করেন? তিনি বলেন, ওছমানকে। পৃথকভাবে একই প্রশ্নে ওছমান (রাঃ) সমর্থন করেন আলীকে’। এর ফলে নেতৃত্ব দু’জনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ) বের হ’লেন শহরে উপস্থিত বিচক্ষণ লোকদের মতামত যাচাইয়ের জন্য। নির্ধারিত তিনদিন তিন রাতের মধ্যে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করে সাধ্যমত জনমত যাচাই করেন। কিন্তু কেবলমাত্র ‘আম্মার ও মিক্বদাদ (রাঃ) ব্যতীত সকলের নিকট থেকেই তিনি ওছমান (রাঃ)-এর পক্ষে সমর্থন পান। এভাবে তিনি যাকে পরামর্শের যোগ্য মনে করেন তার কাছ থেকেই পরামর্শ নেন এবং বাকী সময়টা ছালাত, দো‘আ ও ইস্তেখারার মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিন রাত তিনি খুবই কম ঘুমিয়েছেন’।[৮৪]

খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ওমর ফারূক (রাঃ) কয়েকটি নিয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন- (১) তিন দিন তিন রাতের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন। (২) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহকে (স্রেফ রায় দেওয়ার জন্য) উক্ত শূরার সাথে যুক্ত করে দেন। ‘যদি তিন তিন সমভাগ হয়ে যায়, সে অবস্থায় আব্দুল্লাহ্র রায় চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে’।[৮৫]

---

৮২. বুখারী হা/৩৭০০; আব্দুর রহমান কীলানী, খেলাফত ও জমহূরিয়াত (লাহোর : মাজলিসুত তাহক্বীক্বিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮৮), ৬৫-৬৬ পৃ.।
৮৩. বুখারী হা/৭২০৭ ‘আহকাম’ অধ্যায়-৯৩, ‘কিভাবে লোকেরা আমীরের বায়‘আত নেবে?’ অনুচ্ছেদ-৪৩।
৮৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/১৫১; খেলাফত ও জমহূরিয়াত ৬৭-৬৮ পৃ.।
৮৫. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আশ-শূরা ফী যিল্লি নিযা-মিল হুকমিল ইসলামী (কুয়েত : দারুস সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ : ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ., মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৮) ১১৪ পৃ.; বুখারী হা/৩৭০০।

(৩) মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)-কে এই হুকুম দিয়ে যান যে, এই ছয়জন ব্যক্তি যতক্ষণ না একজনকে খলীফা নির্বাচন করবেন, ততক্ষণ তুমি কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিবে না। সেমতে হযরত মিক্বদাদ ও আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিন দিনের জন্য ছুহায়েব (রাঃ)-কে মসজিদে নববীর ইমাম নিয়োগ করেন এবং নিজেরা ৫০ জনের একটি দল নিয়ে মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) বা কারু মতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহের দরওয়াযায় পাহারা দিতে থাকেন। যাতে কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ব্যতীত। কেননা ঐ গৃহে তখন শূরার সদস্যগণ নেতৃত্ব নির্বাচনের আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন।

তিন দিন পরে ফজরের সময় যখন আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) মসজিদে নববীতে এলেন খলীফার নাম ঘোষণা করার জন্য, তার পূর্বে তিনি দু'জনের নিকট থেকে ওয়াদা নেন যে, যার হাতেই বায়'আত করা হবে, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র উপরে আমল করবেন এবং তিনি যার হাতেই বায়'আত করবেন, অন্যজন তার নিকট বায়'আত করবেন।[৮৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রথমে যুবায়ের ও সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছকে ডেকে এনে পরামর্শ করেন। অতঃপর আলীকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে বলেন, আমি যদি আপনাকে খলীফা নির্বাচন করি, তাহ'লে আপনি ন্যায়বিচার করবেন এবং যদি ওছমানকে নির্বাচন করি, তাহ'লে আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন। এরপর ওছমান (রাঃ)-এর কাছ থেকেও তিনি পৃথকভাবে অনুরূপ ওয়াদা নেন।

এরপর তিনি মসজিদে নববীতে উভয়কে সাথে নিয়ে আসেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে (হাম্‌দ ও ছানা শেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর) ওছমান (রাঃ)-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে তিনবার বলেন, اَللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ، اَللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ،

৮৬. আল-বিদায়াহ ৭/১৫২; খেলাফত ৬৯ পৃ.।

اَللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ، اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ خَلَعْتُ مَا فِىْ رَقَبَتِى مِنْ ذَلِكَ فِىْ رَقَبَةِ عُثْمَانَ– 'হে আল্লাহ! তুমি শোন ও সাক্ষী থাক (তিনবার)। হে আল্লাহ! আমার স্কন্ধে যে বোঝা ছিল, আমি তা ওছমানের স্কন্ধে অর্পণ করলাম'। অতঃপর তিনি মিম্বরের সর্বোচ্চ স্তরে বসেন ও ওছমানকে ২য় স্তরে বসান। অতঃপর প্রথমে হযরত আলী (রাঃ) বায়'আত করেন। এরপর উপস্থিত মদীনাবাসী মুহাজির, আনছার, সেনাপতিবৃন্দ ও জনগণ দলে দলে বায়'আত করতে থাকেন'। খলীফা হওয়ার পর ওছমান (রাঃ) আছরের জামা'আতে ইমামতি করেন। অতঃপর জনসমক্ষে প্রথম ভাষণ দেন'।[৮৭]

(৪) আলী (রাঃ)-এর নির্বাচন :

বিদ্রোহীদের হাতে হযরত ওছমান (রাঃ) শহীদ হ'লে মদীনায় উপস্থিত ছাহাবীগণের সমর্থনে হযরত আলী খলীফা হন। বর্ণিত হয়েছে যে, খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর দাফনের পূর্বেই অথবা পরে লোকেরা হযরত আলীকে খলীফা হবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তখন তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু লোকেরা সেখানে গিয়ে দরজা ধাক্কাতে থাকে। তখন দরজা খুলে দিলে হযরত ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল লোক গৃহে প্রবেশ করে। তারা তাঁকে বলেন, إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لاَ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِلاَ أَمِيرٍ 'এই ইমারত আমীর ব্যতীত চলতে পারে না'। অবশেষে তাদের বারবার অনুরোধে তিনি রাযী হন ও প্রথমে ত্বালহা (রাঃ) বায়'আত করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে গমন করেন ও মিম্বরে গিয়ে বসেন। তখন সবাই আনুগত্যের বায়'আত নেন *(আল-বিদায়াহ ৭/২৩৭)*। এতে বুঝা যায় যে, অস্থিতিশীল অবস্থায় আহলে শূরা ছাড়াও রাজধানীর কিছু সংখ্যক বিচক্ষণ ব্যক্তির মাধ্যমেও নেতৃত্ব নির্বাচন হ'তে পারে।

হাসান (রাঃ)-এর নির্বাচন :

৪০ হিজরীর রামাযান মাসের শেষ দশকে আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পর খাযরাজ নেতা ক্বায়েস বিন সা'দ বিন ওবাদাহ-এর বায়'আতের মাধ্যমে

---

৮৭. আল-বিদায়াহ ৭/১৫২; বুখারী হা/৭২০৭; খেলাফত ৬৪-৬৫ পৃ.।

আলী (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন এবং সকলে তা মেনে নেন *(আল-বিদায়াহ ৮/১৪)*। যার সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ قَيْس بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيْرِ– 'ক্বায়েস বিন সা'দ (বিন ওবাদাহ আনছারী) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য শাসকের দেহরক্ষীর ন্যায়' *(আল-বিদায়াহ ৫/৩৩৭)*।[৮৮] এতে বুঝা যায় যে, উম্মতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তি যদি পূর্বতন নেতার সৎ ও যোগ্য পুত্রকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে।

খেলাফত লাভের ৬ মাস পর হাসান (রাঃ) উম্মতের ঐক্যের স্বার্থে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকূলে স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করলে মু'আবিয়া (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হন। আর এভাবেই রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয় *(আল-বিদায়াহ ৮/১৬)*। যেখানে তিনি বলেছিলেন, إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ– 'আমার এই বেটা হ'ল নেতা। আল্লাহ এর দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন'।[৮৯] তিনি আরও বলেছিলেন, الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، 'আমার পরে খেলাফত থাকবে ৩০ বছর'।[৯০] ১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ৪১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে হাসান (রাঃ)-এর খেলাফত ত্যাগ করা পর্যন্ত খেলাফতে রাশেদাহ্র মেয়াদকাল ৩০ বছর পূর্ণ হয়।

অছিয়ত বিহীন অবস্থায় নির্বাচন : পূর্বতন নেতা কাউকে অছিয়ত বা মনোনয়ন না দিয়ে গেলে কিংবা একাধিক ব্যক্তির কোন প্যানেল না দিয়ে গেলে, সে অবস্থায় তাঁর সময়ের মজলিসে শূরার সদস্যগণ একত্রে

---

৮৮. বুখারী হা/৭১৫৫; তিরমিযী হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/৩৬৯২ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮।

৮৯. বুখারী হা/২৭০৪; মিশকাত হা/৬১৩৫ 'মানাক্বিব' অধ্যায়-৩০, রাবী আবু বাকরাহ (রাঃ)।

৯০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৪৩; তিরমিযী হা/২২২৬; আহমাদ হা/২১৯৭৮; মিশকাত হা/৫৩৯৫ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়-২৭, রাবী রাসূল (ছাঃ)-এর গোলাম সাফীনাহ (রাঃ)।

পরামর্শের মাধ্যমে পরবর্তী আমীর বা খলীফা নির্বাচন করবেন। শূরা সদস্যগণকে জাতির পক্ষ থেকে যেকোন মূল্যে এ গুরুদায়িত্ব পালন করতেই হবে। কারণ তারাই হ'লেন মূল নির্বাচক। এটি অন্যের হাতে ছেড়ে দিলে সর্বত্র ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে, যা আল্লাহ্র কাম্য নয়। আর দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে আল্লাহ্র নিকট তারা কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন এবং আমানতের খেয়ানতের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

(১) নেতৃত্ব নির্বাচন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (২) নেতৃত্ব যেকোন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না (৩) নির্বাচকদের আবেগমুক্ত ও নিরপেক্ষ এবং এমনকি নেতার চাইতেও দূরদর্শী হওয়া আবশ্যক (৪) নির্বাচক এমনকি একক ব্যক্তিও হ'তে পারেন (৫) নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বোধে অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া যেতে পারে (৬) নির্বাচকের রায়ই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে (৭) নির্বাচিতকে সবাই মেনে নিবেন (৮) শূরা সদস্যদের সংখ্যা স্বল্প ও সীমিত হবে (৯) নির্বাচক ও নির্বাচিত উভয়ে শূরার অন্তর্ভুক্ত হবেন (১০) নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া যাবে না (১১) ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'লেও ঘোষিত নেতৃত্বকে মেনে নিতে হবে। (১২) প্রথমে শূরা সদস্যদেরকে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নিতে হবে। (১৩) শূরা সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হ'লে তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত থাকবে এবং তা সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যে অথবা যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তি করে একমত হ'তে হবে। কেননা নেতৃত্ব নির্বাচনে অন্যদের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই।

নেতৃত্ব বাছাই ও নির্বাচকের যোগ্যতা

(انتخاب الإمارة ومؤهلات المنتخبين)

জনগণের মধ্যে সর্বদা তিনটি দল পরিলক্ষিত হয়। একদল নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন (أَهْلُ الْإِمَامَةِ)। আরেক দল নেতৃত্ব বাছাইকারী (أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ)। আরেক দল নির্বোধ অনুসারী (أَهْلُ التَّقْلِيدِ)। গণতন্ত্রে এরাই হয়

নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রধান নিয়ামক। নেতারা এদেরকেই হুজুগে মাতিয়ে স্বার্থ হাছিল করেন। যার ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলিতে এমন সব নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, যাদেরকে নৈতিকতার কোন মানদণ্ডেই ফেলা যায় না। তাদের কাছে ন্যায়বিচার ও মানবতা কোনটাই নিরাপদ নয়। সেকারণ নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ, সৎ, দূরদর্শী ও সাহসী নির্বাচক মণ্ডলী প্রয়োজন। যারা এমনকি নেতার চাইতে অধিক যোগ্য ও বিচক্ষণ হবেন।

রাষ্ট্রনীতি বিশারদ পণ্ডিত আবুল হাসান আলী আল-মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হি.) নির্বাচকের জন্য প্রধান তিনটি গুণ নির্ধারণ করেছেন : (১) ন্যায়নিষ্ঠা (اَلْعَدَالَةُ)। যেখানে কোনরূপ অন্যায় ও সংকীর্ণতা স্থান পাবে না (২) জ্ঞান (اَلْعِلْمُ)। অর্থাৎ সম্ভাব্য নেতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা এই মর্মে যে, তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পূর্ণভাবে মওজুদ রয়েছে (৩) দূরদর্শিতা ও রায় দানের ক্ষমতা (اَلرَّأْىُ وَالْحِكْمَةُ) এই মর্মে যে, কে নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক অগ্রগণ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন হবেন।

তিনি নেতৃত্বের জন্য উপরোক্ত তিনটি গুণের সাথে আরও চারটি গুণ যোগ করেছেন : (১) চোখ, কান ও জিহ্বা ঠিক থাকার মাধ্যমে দৈহিক অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় বহাল থাকা (২) দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা (৩) বীরত্ব ও সাহসিকতা। যাতে বিরোধী পক্ষের মোকাবিলায় তিনি যোগ্য প্রমাণিত হন (৪) কুরায়শী হওয়া। যদিও এটি সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয় *(আল-আহকামুস সুলত্বা-নিইয়াহ ৬ পৃ.)*। এছাড়া কুরআনের মৌলিক নির্দেশ অনুযায়ী শূরা সদস্যদের প্রত্যেককে তাক্বওয়াশীল হওয়া অপরিহার্য *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। কোন অবস্থাতেই নেতা বা নির্বাচকগণ দ্বীন ও তাক্বওয়াকে হাত ছাড়া করতে পারবেন না।

নেতৃত্ব দান ও নেতৃত্ব বাছাই দু'টিই বড় কঠিন বিষয়। ইসলাম এ দু'টিকে সুশৃংখলভাবে সমাজ পরিচালনার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আর এজন্যেই মুসলমানদের তিনজন একস্থানে থাকলেও বা সফরে থাকলে তাদের মধ্যে একজনকে 'নেতা' নিযুক্ত করতে বলা হয়েছে *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*।

মাওয়ার্দী বলেন, 'উত্তম ব্যক্তি পাওয়া সত্ত্বেও অনুত্তম ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করা যাবে, যদি তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পাওয়া যায়' *(আল-আহকাম ৯ পৃ.)*। কেননা নির্বাচকদের জন্য উত্তম গুণাবলীর অধিক প্রয়োজন এবং নেতা হওয়ার জন্য অধিক প্রয়োজন হ'ল যোগ্যতার ও সাহসিকতার। যদি কোন স্থানে একজনের মধ্যেই গুণাবলী ও যোগ্যতার উভয় শর্ত পাওয়া যায়, তাহ'লে তাঁর কাছেই নেতৃত্ব রেখে দিতে হবে। অন্যত্র নেওয়া যাবে না। যেমন যোগ্যতা ও গুণাবলী অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত একজন বিচারপতিকে তাঁর বিচারাসন থেকে সরানো যায় না, অনুরূপভাবে সৎ ও যোগ্য নেতাকেও তাঁর নেতৃত্ব থেকে সরানো জায়েয নয়' *(ঐ)*।

মেয়াদভিত্তিক নেতা নির্বাচনের বিষয়টি ইসলামে আবশ্যিক নয়। নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য লটারী করাও জায়েয নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথায় বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সেকারণ নেতা আবশ্যক বিবেচনা করলে নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচক মণ্ডলী নিয়োগ করবেন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্র ছয়জন শ্রেষ্ঠ ছাহাবীকে বাছাই করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য। এ দায়িত্ব তিনি সাধারণ জনগণকে দেননি। কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা সাধারণ লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাতে সমাজে ফিৎনা ও বিশৃংখলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

ইমারত ও বায়‘আত

(الإمارة والبيعة)

ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্রের স্তম্ভ হ’ল চারটি : আমীর, মা’মূর, বায়‘আত ও ইত্বা‘আত অর্থাৎ নেতা, কর্মী, অঙ্গীকার ও আনুগত্য। এ চারটি স্তম্ভের কোন একটি না থাকলে ইসলামী জামা‘আত হয়না।

বলা হয়ে থাকে যে, اَلْإِسْلاَمُ دَعْوَةٌ وَالْإِمَارَةُ بَيْعَةٌ ‘ইসলাম’ হয় দাওয়াতের মাধ্যমে এবং ‘ইমারত’ হয় বায়‘আতের মাধ্যমে’। বায়‘আত অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ্র বিধান মানার উদ্দেশ্যে আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের অঙ্গীকার করা। অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সাথী নির্বাচন সম্ভব হয়। এটি দায়িত্বশীলদের জন্য খাছ এবং অন্যদের জন্য ‘আম। যেটাকে জামা‘আতে খাছছাহ্র অধীনে বায়‘আতে খাছছাহ ও বায়‘আতে ‘আম্মাহ বলা যেতে পারে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) প্রয়োজনবোধে কর্মীদের নিকট থেকে একাধিক বার বায়‘আত নিয়েছেন *(মুসলিম হা/১০৪৩)*। হজ্জের ময়দানে রাসূল (ছাঃ) লক্ষাধিক মুমিনের সামনে বিদায়ী ভাষণ দিয়েছেন এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ– ‘উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণের নিকট পৌঁছে দিয়ো’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৫৯)*। একই কথা তিনি মক্কা বিজয়ের ভাষণেও বলেছিলেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৭২৬)*। সে ভাষণ নিকটবর্তী মুষ্টিমেয় মানুষ শ্রবণ করেছেন। পরে তারাই এগুলি অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং সকলে তা মান্য করেছেন। এটিকে বায়‘আতে ‘আম্মাহ বলা যায়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাইকে অনুরূপ বায়‘আতে শামিল করা যায়। যদি তারা একই আক্বীদা ও আমলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চান। এমনকি অনলাইনেও বায়‘আত নেওয়া যায়।

সব সংগঠনেই আনুগত্যের শপথ ও অঙ্গীকার রয়েছে। তবে ইসলামী সংগঠনে বায়‘আতের লক্ষ্য হয় আল্লাহ্র বিধান মানার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। জাহেলী আরবে আল্লাহ্র নামে শপথের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্র বিধান মানার অঙ্গীকার ছিলনা। পরবর্তীতে

নবুঅতের সূচনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র বিধান মানার অঙ্গীকার নিয়ে বায়‘আতের মাধ্যমে জামা‘আত কায়েম করেন। মাক্কী জীবনে জামা‘আতে খাছছাহ এবং মাদানী জীবনে জামা‘আতে ‘আম্মাহ কায়েম হয়। যখন মদীনার প্রধান দু’টি গোত্র আউস ও খাযরাজের নেতারা ইসলাম কবুল করেন। ফলে সেখানে শরী‘আতের বহু ইবাদত ও বৈষয়িক বিধান সমূহ কায়েম করা সম্ভব হয়। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়ন করা সহজ হয়।

জামা‘আতে খাছছাহ বা সংগঠন (الجماعة الخاصة) :

বিচ্ছিন্ন জনগণ যখন নির্দিষ্ট ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তখন তাকে ইসলামী সংগঠন বা জামা‘আতে খাছছাহ বলা হয়। যেখানে কর্মীদের তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে গড়ে তোলা উদ্দেশ্য হয়।[৯১] এই জামা‘আত দ্বীন কায়েমে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

জামা‘আতে ‘আম্মাহ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ জামা‘আত বা সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার তথা ‘ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ’-এর দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- ‘আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম’ *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِّنْ الْأَرْضِ إلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ- وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ- ‘কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে ‘নেতা’ নিযুক্ত না করা পর্যন্ত’ *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*।

৯১. ড. আহমাদ মাহমূদ আলে মাহমূদ (কলা অনুষদ, বাহরায়েন বিশ্ববিদ্যালয়), আল-বায়‘আতু ফিল ইসলাম (দারুর রাযী, তাবি) ১৩৪ পৃ.।

তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন নেতা নির্বাচন করে’ *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮)*।[৯২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، ‘শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিকতর প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চাইতে’।[৯৩] নিঃসন্দেহে একক ব্যক্তির চাইতে সংগঠিত একদল মানুষ অবশ্যই শক্তিশালী এবং আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকারের জন্য যা অবশ্যই যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘জামা‘আত যত বড় হবে, আল্লাহ্র নিকট সেটি তত প্রিয় হবে’।[৯৪] যেমন মুহাজির ও আনছারগণের ঐক্যবদ্ধ জামা‘আতের মাধ্যমে মদীনায় বৃহত্তর ইসলামী খেলাফত কায়েম হয়। আধুনিক যুগে জামা‘আতে খাছছাহ্র আমীর ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯১ খৃ.)-এর নিকটে ১৭৪৪ সালে দির‘ইইয়ার শাসক মুহাম্মাদ বিন সঊদ (১৬৯৭-১৭৬৫ খৃ.)-এর বায়‘আত গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর সঊদী ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি রচিত হয়। যা দির‘ইইয়ার বায়‘আত (مُبَايَعَةُ الدِّرْعِيَّةِ) নামে খ্যাত। সঊদী আরবের সংবিধানে যার প্রতিফলন রয়েছে।[৯৫]

---

৯২. আহমাদ হা/৬৬৪৭ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ); আবুদাঊদ হা/২৬০৮ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ); মিশকাত হা/৩৯১১ ‘জিহাদ’ অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/১৩২২।

৯৩. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়-২৬ ‘তাওয়াক্কুল ও ছবর অনুচ্ছেদ-১।

৯৪. وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ– আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬ ‘জামা‘আত ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-২৩, রাবী উবাই বিন কা‘ব (রাঃ)।

৯৫. ১৯৯২ সালের ৩রা জানুয়ারী ৭٠/أ رقم নম্বর স্মারক অনুযায়ী আধুনিক সঊদী আরবের সংবিধানের ৬ষ্ঠ ধারায় বলা হয়েছে, المادة ٦ - يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره– ‘দেশের নাগরিকগণ বাদশাহ্র নিকট আনুগত্যের বায়‘আত করবে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্র ভিত্তিতে, কষ্টে ও স্বচ্ছলতায় এবং পসন্দে ও অপসন্দে’। অতঃপর ৭ম ধারায় বলা হয়েছে, المادة ٧ - يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة– ‘সঊদী আরব তার রাষ্ট্রে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে। এ দু’টি উৎস হবে সঊদী সংবিধানের এবং প্রশাসনের সর্বত্র চূড়ান্ত নির্দেশ দাতা’।

বস্তুতঃ ইমারতে খাছছাহ্‌র পথ বেয়েই ইমারতে ‘আম্মাহ অর্জিত হওয়া সম্ভব। উভয় আমীরের প্রতি বায়‘আত ও আনুগত্য আবশ্যক। সাংগঠনিক আমীর ‘হদ’ জারী করবেন না বা জিহাদ ঘোষণা করবেন না। কেননা এ দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আমীরের জন্য নির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে জামা‘আতে খাছছাহ্‌র আমীর ছিলেন। তখন তাঁর প্রতি ‘হদ’ জারী করার নির্দেশ আসেনি। অতঃপর মাদানী জীবনে তিনি জামা‘আতে ‘আম্মাহ্‌র আমীর হন। তখন তাঁর উপরে ‘হদ’ জারী করার ও ‘জিহাদ’ ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয় *(হজ্জ ২২/৩৯)*। কিন্তু উভয় অবস্থায় তাঁর বায়‘আত ও আনুগত্য উম্মতের উপরে অপরিহার্য ছিল। অতএব সর্বাবস্থায় একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জামা‘আতী যিন্দেগী যাপন করা মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, সেটা কোন শর্ত নয়।[৯৬]

জামা‘আতে ‘আম্মাহ বা রাষ্ট্রীয় খেলাফত (الجماعة العامة) :

আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর ইসলামী খেলাফতকে জামা‘আতে ‘আম্মাহ বলা হয়। যেখানে ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান সমূহ কায়েম হয়। এই আমীরের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক (إِجْبَارِى), যতক্ষণ তিনি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে ইসলামী বিধান মোতাবেক দেশ পরিচালনা করেন। উক্ত আমীর থাকতে অন্য কাউকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا– ‘যখন দুইজন খলীফার বায়‘আত করা হবে, তখন পরের জনকে হত্যা কর’।[৯৭] তবে আমীর যদি কোন গোনাহের আদেশ দেন, তাহ’লে তার প্রতি কোন আনুগত্য নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى

৯৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) ৩৬৫-৬৭ পৃ. ‘ইমামত ও ইমারত-এর মাসআলা’ অনুচ্ছেদ, টীকাসহ।
৯৭. মুসলিম হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩৬৭৬ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ– 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর পসন্দে বা অপসন্দে আমীরের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না গোনাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। গোনাহের আদেশ দেওয়া হ'লে তা শোনা বা মান্য করা যাবে না'।[৯৮]

আমীরের প্রতি সর্বদা ইখলাছপূর্ণ উপদেশ ও উত্তম পরামর্শ দান অপরিহার্য। যা নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ، ثَلاَثًا. قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ– 'দ্বীন হ'ল নছীহত' (৩ বার)। আমরা বললাম, কাদের জন্য! তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য'।[৯৯] 'আল্লাহ্র জন্য নছীহত' অর্থ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখা এবং তাঁর সাথে অন্যকে শরীক না করা। 'কিতাবের জন্য নছীহত' অর্থ কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে বিশ্বাস করা ও তার আদেশ-নিষেধ সমূহ মান্য করা। 'রাসূলের জন্য নছীহত' অর্থ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করা ও তাঁর প্রদর্শিত পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে মেনে নেওয়া। 'মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নছীহত' অর্থ তাদের কল্যাণকামী থাকা, তাদের আনুগত্য করা ও তাদেরকে সঠিক উপদেশ দেওয়া। এর দ্বারা খলীফা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও বুঝানো হয়েছে, যারা সমাজে দ্বীন কায়েম করেন। অতঃপর 'সাধারণ মুসলমানদের জন্য নছীহত' অর্থ তাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনের কল্যাণ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ও অকল্যাণ থেকে সতর্ক করা। ত্বীবী বলেন, 'নছীহত'-এর মূল কথা হ'ল, যাকে নছীহত করা হয় তার প্রতি ইখলাছপূর্ণ ভালোবাসা পোষণ করা (خُلُوصُ الْمَحَبَّةِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ وَالتَّحَرِّي فِيمَا يَسْتَدْعِيهِ حَقُّهُ) এবং যার যা হক তাকে তা প্রদান করা' *(মিরক্বাত)*।

---

৯৮. বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।
৯৯. মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১, রাবী তামীম দারী (রাঃ)।

যদি আমীর যুলুম করেন বা গোনাহের কাজ করেন, তবুও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، ‘যে ব্যক্তি তার আমীরের নিকট থেকে অপসন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন তাতে ছবর করে’।[১০০] কারণ বিদ্রোহের মাধ্যমে পুরা সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। বরং উত্তম হ’ল, সাধ্যমত আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালন করা এবং বিষয়টির চূড়ান্ত ফায়ছালা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেওয়া।

জামা‘আতবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতা (وجوب الحياة الجماعية) :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ– ‘তোমাদের উপরে জামা‘আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ’ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ’ল। কেননা শয়তান থাকে একজনের সাথে এবং সে দু’জন থেকে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা‘আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়’।[১০১] (২) তিনি বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى– ‘মুমিনদের পারস্পরিক ভালবাসা, অনুগ্রহ ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত একটি দেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ ব্যথাতুর হয়, তখন তার সর্বাঙ্গ ব্যথাতুর হয় জাগরণে অথবা জ্বর অবস্থায়’।[১০২]

(৩) তিনি বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ– ‘জামা‘আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান থাকে তার সাথে, যে জামা‘আত থেকে দৌড়ে বিচ্ছিন্ন হয়’।[১০৩]

---

১০০. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮ রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।
১০১. তিরমিযী হা/২১৬৫ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।
১০২. মুসলিম হা/২৫৮৬; বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩ রাবী নো‘মান বিন বাশীর (রাঃ)।
১০৩. নাসাঈ হা/৪০২০ রাবী ‘আরফাজা বিন শুরাইহ আল-আশজা‘ঈ; তিরমিযী হা/২১৬৬ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ); মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬২১।

(৪) তিনি আরও বলেন, –الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হ’ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ’ল আযাব’ *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*।

তাছাড়া জামা‘আতে ছালাতের নেকী ২৫ বা ২৭ গুণ বেশী হওয়ার মধ্যে এবং ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ-যাকাত সকল বিষয় জামা‘আতবদ্ধভাবে পালনের মধ্যে জামা‘আতী যিন্দেগীর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[১০৪]

বায়‘আত ও আনুগত্যের স্বরূপ (نوع البيعة والاطاعة) :

জামা‘আতে খাছছাহ্‌র আমীরের প্রতি বায়‘আত ঐচ্ছিক (إِخْتِيَارِى)। কিন্তু বায়‘আত করার পর শারঈ কারণ ব্যতীত তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিধেয় নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً– ‘আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*। আর বায়‘আত হবে স্রেফ আল্লাহ্‌র নামে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল’।[১০৫] এর মাধ্যমে উক্ত পাপের কঠোরতা (التَّغْلِيظ) বুঝানো হয়েছে *(তিরমিযী, ঐ)*। বস্তুতঃ অঙ্গীকার ও আনুগত্য ব্যতীত কোনরূপ সামাজিক স্বার্থ অর্জন করা সম্ভব নয়। আর বায়‘আত হয়ে থাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য। আল্লাহ্‌র আনুগত্য বিরোধী কোন কাজে বায়‘আত শব্দ প্রযোজ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, জামা‘আতে ‘আম্মাহ ও জামা‘আতে খাছছাহ্‌র আমীরের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ হ’লে জামা‘আতে ‘আম্মাহ অগ্রাধিকার পাবে।[১০৬]

---

১০৪. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)। উল্লেখ্য যে, ২৫ গুণ ছওয়াব-এর রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ), যেমন বুখারী হা/৬৪৭; মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২। মর্ম একই। অর্থাৎ অসংখ্য নেকী।

১০৫. তিরমিযী হা/১৫৩৫; মিশকাত হা/৩৪১৯ ‘শপথ ও মানত সমূহ’ অধ্যায়-১৫, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

১০৬. প্রফেসর ড. যুহায়ের ওছমান আলী নূর, জামে‘আতুল ইমারাতিল ‘আরাবিইয়াহ, মাজাল্লাতুশ শারী‘আহ ওয়াল ক্বানূন (আরব আমিরাত : ৩০তম বর্ষ, রবীউছ ছানী ১৪২৮ হি./এপ্রিল ২০০৭ খৃ.) শিরোনাম : ‘আল-বায়‘আতু ফিস-সুন্নাতিন নাবাবিইয়াহ’ ৩৭৯-৮২ পৃ.।

কারণ বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত। আর আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় কৈফিয়ত তাঁকেই দিতে হবে। যে বিষয়ে হাদীছে কঠিনভাবে তাকীদ এসেছে।[১০৭]

বিভিন্ন স্থানে তাবলীগী কাফেলা ও ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণের সময় রাসূল (ছাঃ) ও খলীফাদের যামানায় খাছ খাছ আমীর বা নেতা নির্বাচন করা হ’ত। যাদের প্রতি আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। যেমন,

(ক) ৯ম হিজরীতে আবুবকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে হজ্জের কাফেলা প্রেরণ করা হয়। পিছে পিছে হযরত আলী (রাঃ)-কে পাঠানো হয় মুশরিকদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেওয়ার জন্য। পথিমধ্যে সাক্ষাত হ’লে আবুবকর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমীর না মামূর? তিনি বললেন, মামূর’।[১০৮] আলী (রাঃ)-এর উক্ত বক্তব্যই ছিল তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুখে বায়‘আত শব্দ উচ্চারণ করুন বা না করুন, আনুগত্য অপরিহার্য। নইলে সংগঠনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। ‘আর আল্লাহ বিশৃংখলা পসন্দ করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২০৫)*।

(খ) রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে ৯ম হিজরীর রবীউল আখের মাসে হাবশার নৌদস্যুদের বিরুদ্ধে একটি ছোট সেনাদল সহ প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনীর সদস্য প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, সেনাপতি ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং তার মধ্যে ঠাট্টা করার মেযাজ ছিল। পথিমধ্যে সেনাদল এক স্থানে অবতরণ করে। সেখানে তারা শরীর গরম করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে। তখন সেনাপতি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আমার কথা শোনা ও মান্য করা কি তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়? সবাই বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ দিলে তোমরা কি তা মান্য করবে? সকলে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি চাই তোমরা এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দাও! অতঃপর সকলে

---

১০৭. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২; মিশকাত হা/৩৬৮৬ রাবী মা‘ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)। অত্র বইয়ের ‘আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য’ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০৮. মুহাম্মাদ আল-গাযালী আস-সাক্বা (মৃ. ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.) ফিক্বহুস সীরাহ (দিমাশক্ব : দারুল ক্বলম, ১ম প্রকাশ : ১৪২৭ হি./২০০৬ খৃ., তাখরীজ : মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী) ৪১৭ পৃ., সনদ হাসান; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮০। মূল হাদীছটি রয়েছে বুখারী হা/১৬২২; মুসলিম হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২৫৭৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, তারা ঝাঁপ দিবে, তখন তিনি বললেন, أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ– 'তোমরা থাম! আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছিলাম মাত্র'। পরে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি বলেন, مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ 'যে ব্যক্তি তোমাদের কোন পাপকর্মের নির্দেশ দিবে, তোমরা তা মান্য করবে না'।[১০৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে সূরা নিসা ৫৯ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা ঝগড়া কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯; মুসলিম হা/১৮৩৪)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্র পরে রাসূলকে আনা হয়েছে এবং রাসূলের সাথে নেতার আনুগত্যকে যুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন। কিন্তু আমীর বা নেতার আনুগত্য কুরআন ও সুন্নাহ্র আনুগত্যের শর্তাধীন। এখানে 'উলুল আমর' অর্থ আমীর বা নেতা। ওলামা নন, যেমনটি প্রচলিত আছে'।[১১০] কেননা আলেমের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু আমীর থাকেন একজন। এতে সামাজিক শৃংখলা বজায় থাকে। যদিও আলেমদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সর্বদা বেশী। তারা জনগণকে ফৎওয়া দিবেন এবং বিভিন্ন সদুপদেশ দিবেন।

---

১০৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৫৮; আহমাদ হা/১১৬৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৩; ছহীহাহ হা/২৩২৪; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৮১ পৃ., সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজাযযিয আল-মুদলেজী ক্রমিক-৮৭।

১১০. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৭১৩৭-এর পূর্বে উক্ত অনুচ্ছেদের আলোচনা ১৩/১১১; ত্বাবারী; ক্বাসেমী, তাফসীর সূরা নিসা ৫৯ আয়াত।

বায়‘আতের উদ্দেশ্য (غرض البيعة) :

বায়‘আতের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জামা‘আতবদ্ধভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা। যেমন,

(১) আল্লাহ বলেন, أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، ‘তিনি তোমাদের জন্য এই পথ নির্ধারণ করেছেন যে, তোমরা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে এবং এতে কোনরূপ অনৈক্য সৃষ্টি করবে না’ *(শূরা ৪২/১৩)*।

(২) তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়’ *(ছফ ৬১/৪)*। (৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই-ই মাত্র আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে’।[১১১]

ইসলাম নিঃসন্দেহে প্রচারধর্মী হ’লেও এর মূল উদ্দেশ্য হ’ল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্বীনের বিধান সমূহ পালন করা। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলাম কবুলকারী ব্যক্তিদের বায়‘আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ‘তাযকিয়াহ’ ও ‘তারবিয়াহ’ অর্থাৎ পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলেন। ফলে তাদের যেসব তৎপরতা এতদিন দুনিয়া কেন্দ্রিক ছিল, তা নিমেষে আখেরাত কেন্দ্রিক হয়ে যায়। তাদের পার্থিব জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন। যদিও ফাসেক, মুনাফিক ও মুরতাদের ফিৎনা তখনও ছিল এবং সকল যুগেই কমবেশী থাকবে।

বায়‘আতের গুরুত্ব (أهمية البيعة) :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

---

১১১. বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৩৮১৪ ‘জিহাদ’ অধ্যায়-১৯, রাবী আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের নিকট থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, সেদিন বাঁচার জন্য তার নিকটে কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[১১২]

(২) মিশকাতের ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, سُمِّيَتِ الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الْإِسْلاَمِ بِالْمُبَايَعَةِ تَشْبِيْهًا لِّنَيْلِ الثَّوَابِ فِىْ مُقَابَلَةِ الطَّاعَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّذِىْ هُوَ مُقَابَلَةُ مَالٍ، كَأَنَّهُ بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية– 'ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বায়'আত (ক্রয়-বিক্রয়) বলা হয়েছে, যেমন ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে সম্পদ লাভ হয়। অনুরূপভাবে আমীরের নিকটে আনুগত্যের বিপরীতে নেকী লাভ হয়। সে যেন আমীরের নিকট তার সবকিছু বিক্রি করে দেয় এবং তার খালেছ হৃদয় ও আনুগত্য তাকে প্রদান করে'। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল খরীদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে...' *(তওবা ৯/১১১)*।[১১৩]

বারবার বায়'আত করা (البيعة مرارا) :

'আওফ বিন মালেক আল-আশজা'ঈ (রাঃ) বলেন, আমরা ৭, ৮ বা ৯ জন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, তোমরা কি

১১২. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৪ পৃ.।

১১৩. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হি./১৯০৪-১৯৯৩ খৃ.), মির'আতুল মাফাতীহ (বেনারস, ভারত : ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খৃ.) হা/১৮-এর ব্যাখ্যা, ১/৭৫ পৃ.।

আল্লাহ্র রাসূলের নিকট বায়‘আত করবে না? অথচ আমরা মাত্র কিছুদিন পূর্বে বায়‘আত করেছিলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো আপনার নিকট বায়‘আত করেছি। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট বায়‘আত করবে না? তখন আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার নিকট বায়‘আত করেছি। এখন আমরা কিসের উপর বায়‘আত করব? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে ও আমীরের আনুগত্য করবে। আরেকটি কাজ তিনি চুপে চুপে বললেন, তোমরা মানুষের কাছে কিছু চাইবেনা’ *(মুসলিম হা/১০৪৩)*। অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনবোধে বারবার বায়‘আত করা যায়। যাতে ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন প্রকার বায়‘আত (المبايعات المختلفة) :

(১) নাসাঈ ৪০ নং ‘বায়‘আত’ (اَلْبَيْعَةُ) অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বায়‘আতের ১৭টি অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে যা শায়েখ আলবানীর তাহকীক কৃত নাসাঈতে হা/৪১৪৯ হ’তে ৪২১১ পর্যন্ত ৪১৬০ ও ৪১৬৮ ২টি যঈফ হাদীছ বাদে মোট ৬০টি ছহীহ হাদীছে সংকলিত হয়েছে। যেমন,

(١) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (‘আমীরের আদেশ শ্রবণ ও মান্য করা’ অনুচ্ছেদ)। (٢) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَّ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (‘আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না’ অনুচ্ছেদ)। (٣) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ (‘সত্য কথা বলার উপরে বায়‘আত’ অনুচ্ছেদ)। (٤) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ (‘ন্যায় কথা বলার উপরে বায়‘আত’ অনুচ্ছেদ)। (٥) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ (‘অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হ’লে তাতে ধৈর্যধারণের উপর বায়‘আত’ অনুচ্ছেদ)। (٦) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (‘প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদুপদেশ দেওয়ার উপর বায়‘আত’

অনুচ্ছেদ)। (٧) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ ('যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (٨) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ ('আমৃত্যু দৃঢ় থাকার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (٩) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ ('জিহাদের উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٠) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهِجْرَةِ ('হিজরত করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١١) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ('পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে আনুগত্য করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٢) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ ('মুশরিক হ'তে পৃথক থাকার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٣) بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ('মহিলাদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٤) بَابُ بَيْعَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ ('ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٥) بَابُ بَيْعَةِ الْغُلاَمِ ('বালকদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٦) بَابُ بَيْعَةِ الْمَمَالِيكِ ('ক্রীতদাসদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (١٧) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ ('মানুষের সাধ্যের অধীন কাজে আনুগত্য করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। বায়'আতগুলি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জামা'আতে 'আম্মাহ ও খাছছাহ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমারত ও বায়'আত পর্যালোচনা (مراجعة فى الإمارة والبيعة) :

মুসলিম উম্মাহ ইসলামী হুকূমতের অধীনে থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় তারা আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকবে কি-না, এ বিষয়ে ভারতবর্ষের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। ইমামতপন্থী আহলেহাদীছগণ আমীরের নিকট বায়'আতের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ওয়াজিব বলেন। যদি তা না হয় তাহ'লে তাদের জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করার অবস্থা হবে। তারা বলেন, ইসলামী হুকূমতের

চলমান অবস্থায় ইসলামী দণ্ডবিধি জারী করার দায়িত্ব হুকূমতের ‘আমীর’-এর উপর ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু সাংগঠনিক আমীরের উপর কেবল শারঈ অনুশাসনমূলক ক্ষমতা থাকবে। ইবনুল ‘আরাবী (রহঃ) বলেন, وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالطَّالِبِ، فَأَمَّا الْحُدُودُ فَلاَ يَحْكُمُ فِيهَا إِلاَّ السُّلْطَانَ، ‘আর এটি হ’ল মাল-সম্পদ ও অন্যান্য দাবী-দাওয়ার বিচার-ফায়ছালার ক্ষেত্রে। কিন্তু দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের অধিকার থাকবে কেবল শাসকের’।[১১৪] অর্থাৎ জামা‘আতে ‘আম্মাহ্‌র নেতার।

নবীগণের মধ্যে হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) ব্যতীত কোন নবীই ‘জামা‘আতে আম্মাহ্‌র’ মালিক ছিলেন না। কিন্তু সকল নবীই ‘জামা‘আতে খাছছাহ্‌র’ মালিক ছিলেন। তাঁরা বলেন, এমনকি তিনজন মুসলমান একস্থানে থাকলেও তাদেরকে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। আমীর বিহীন কোন দলকে তাঁরা ‘জামা‘আত’ হিসাবে গণ্য করেন না। তাঁরা বলেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যাও আমীর বিহীন জীবন যাপন করা শরী‘আতে বৈধ নয় *(থিসিস ৩৬৫ পৃ.)*। উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের এই জামা‘আত ‘জামা‘আতে গোরাবা’ ও ‘জামা‘আতে মুজাহেদীন’ নামে পরিচিত।

বিরোধী পক্ষের বক্তব্য :

ইমামত বিরোধী আহলেহাদীছ আলেমগণ ইমারতের পক্ষের হাদীছ ও আছার সমূহের বিপরীতে কোন হাদীছ বা আছার পেশ করতে পারেননি। তবে কিছু যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁরা হাদীছে বর্ণিত ইমাম বা আমীরকে জিহাদকারী হওয়ার ও শারঈ হুদূদ বা দণ্ডবিধি সমূহ জারী করার অধিকারী হওয়াকে পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেন। বায়‘আত গ্রহণের বিষয়টিকে তাঁরা আবশ্যিক ধর্মীয় বিষয় বলে মনে করেন না, যা পরিত্যাগ করলে গোনাহগার হ’তে হবে। অবশ্য সাংগঠনিক শৃংখলা রক্ষার জন্য তাঁরা আর পাঁচটি সামাজিক সংগঠনের ন্যায় ‘ছদর’ ‘রঈস’ বা সভাপতি এমনকি ‘আমীর’ নির্বাচনও সমর্থন করে থাকেন।

---

১১৪. কুরতুবী, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ৪১ আয়াত, ৬/১৭১ পৃ.।

মন্তব্য : বর্তমান সময়ের জনৈক কুয়েতী আহলেহাদীছ আলেম উপরোক্ত হাদীছগুলিকে দু'টি পৃথক ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যেসকল হাদীছে আনুগত্যের বায়'আত ব্যতীত জাহেলিয়াতের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তাঁর মতে সে হাদীছগুলিতে 'জামা'আতে আম্মাহ' বা রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। আর বাকী হাদীছগুলিতে যোগ্য আমীরের অধীনে বিশেষ বিশেষ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে। এই সকল জামা'আতকে তিনি 'জামা'আতে খাছছাহ' বা বিশেষ জামা'আত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানের সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই যথাযথভাবে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম নেই, সে অবস্থায় পৃথিবীর সকল স্থানে খাছ খাছ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জীবন যাপন করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। 'জামা'আতে খাছছাহ'গুলি পরস্পরে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের কাজে সহযোগিতা করবে এবং সম্মিলিতভাবে জামা'আতে 'আম্মাহ গঠনের চেষ্টা করবে।[১১৫]

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাগূতের নিকট বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যেতে নিষেধ করেছে *(নিসা ৪/৬০)*। ফলে মুসলমান যেখানেই থাকুক তাকে সর্বদা একজন যোগ্য মুত্তাক্বী আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। কেননা জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে *(তিরমিযী হা/২১৬৬)*। যাতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয় *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

এক্ষণে ইমারত ও বায়'আতের ভিত্তিতে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অসংখ্য হাদীছ ও আছার পাওয়ার পরেও যদি আমরা তা পরিত্যাগ করি ও কেবল যুক্তির অনুসরণ করি, তাহ'লে সেটি ভুল হবে। কারণ তাতে মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করবে এবং অনৈসলামী শক্তির ক্রীড়নক হবে। যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাবে।

---

১১৫. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, নিবন্ধ : উছূলুল 'আমালিল জিমা'ঈ (জামা'আত গঠনের মূলনীতি সমূহ) মাসিক 'আল-ফুরক্বান' (ছাফাত-কুয়েত : ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০ খৃ.)।

উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শিক্ষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা সাইয়েদ নাযীর হোসায়েন দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খৃ.) শিষ্যদের নিকট থেকে আনুগত্যের ‘বায়‘আত’ নিতেন। বাংলা ১২৯২ সাল মোতাবেক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একবার বাংলাদেশ সফরে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদের দেবকুণ্ডে এলে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। তারা সকলে উক্ত মাহফিলে তাঁর নিকট ‘বায়‘আত’ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। অমনিভাবে পাঞ্জাব সফরেও বহু লোক তাঁর হাতে বায়‘আত করে।[১১৬] বস্তুতঃ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত এবং বাংলা-আসাম ও বিহারে আহলেহাদীছের যে সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, তার মূলে ছিল জিহাদ আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলনেরই অবদান।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য হবে, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সার্বিক সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যেভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম আগমনকারী আরব বণিক ও স্থানীয় মুসলিমগণ তাদের নির্বাচিত আমীরের মাধ্যমে ইসলামী শরী‘আত মোতাবেক পরিচালিত হ’তেন, যদিও সেখানকার রাজনৈতিক প্রশাসন ছিল অমুসলিমদের হাতে।[১১৭]

বায়‘আতের ফলাফল (ثمرة المبايعة) :

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কৃত বায়‘আত আমীর ও মামূর উভয়ের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং আল্লাহ্‌র বিধান মানতে উদ্বুদ্ধ করে। এর দুনিয়াবী প্রভাব ও আখেরাতের ফযীলত সর্বাধিক। ১১, ১২ ও ১৩ নববী বর্ষে ইয়াছরিব থেকে আগত ৬, ১২ এবং ৭৫ জন হাজীর নিকট থেকে রাসূল (ছাঃ) ইসলামের বায়‘আত গ্রহণ করেন। সর্বশেষ ১৩ নববী বর্ষের ১২ই যিলহাজ্জ বায়‘আতে কুবরা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭৫ দিনের মাথায় ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ী থেকে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে ইয়াছরিবে হিজরত শুরু করেন এবং ৮ই রবীউল

১১৬. মৌলবী ফযল হোসায়েন মোযাফ্‌ফরপুরী বিহারী (মৃ. ১৩২৬ হি./১৯০৮ খৃ.) ‘আল-হায়াত বা‘দাল মামাত’ (উর্দূ; করাচী : মাকতাবা শু‘আইব, ১৩৭৯ হি./১৯৫৯ খৃ.) ২৬৬-৬৭ পৃ.; থিসিস ৩৪৩ পৃ.।

১১৭. থিসিস ৪০৩ পৃ., টীকা-৩।

আউয়াল সোমবার দুপুরে ইয়াছরিবের ক্বোবা উপশহরে উপনীত হন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২২৬, ২৩৮ পৃ.)*। পরবর্তীতে যার নাম হয় 'মদীনা'। উক্ত বায়'আতে কুবরা-র ফযীলত বর্ণনা করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।-

(১) إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরীদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের প্রতি (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা রয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবাহ ৯/১১১)*।

বায়'আতে কুবরা-য় অংশগ্রহণকারীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ 'বায়'আত করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব'? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাত' (اَلْجَنَّةُ)। তখন তারা খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠেন, رِبْحُ الْبَيْعِ لاَ نُقِيْلُ وَلاَ نَسْتَقِيْلُ 'ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা কখনোই ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না'। এসময় অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১১৮] সেকারণ সূরা তওবা 'মাদানী' সূরা হ'লেও এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে 'মাক্কী'।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, লোকেরা বলে উঠল, –فَوَاللهِ لاَ نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلاَ نَسْتَقِيلُهَا 'আল্লাহ্র কসম! আমরা এই বায়'আত ভঙ্গ করব না এবং বায়'আত প্রত্যাহার করার আবেদনও করব

১১৮. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবাহ ১১১ আয়াত।

না’ ।[১১৯] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَوَاللهِ لاَ نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَداً وَلاَ نَسْلُبُهَا أَبَداً– ‘আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই এই বায়‘আত পরিত্যাগ করব না এবং তা কখনোই বাতিল করব না’ *(আহমাদ হা/১৪৪৯৬, সনদ ছহীহ)*।

(২) বায়‘আতের উপরে আল্লাহ্র হাত থাকে। যেমন ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে অনুষ্ঠিত বায়‘আতে রিযওয়ান উপলক্ষ্যে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْراً عَظِيْماً– ‘নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে আনুগত্যের বায়‘আত করল, তারা আল্লাহ্র নিকটেই বায়‘আত করল। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপরে রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ শীঘ্র তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১০)*।

আল্লামা ক্বাসেমী বলেন, ‘আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে’ কথাটি বায়‘আতের তাকীদ হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ বায়‘আতের সময় আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর ছিল। যেন তারা তাঁর নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্র হাতেই বায়‘আত করছে’ *(ক্বাসেমী)*।

(৩) একই উপলক্ষ্যে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বায়‘আত করেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনে নিলেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়’ *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*।

উক্ত বায়‘আতের ফযীলত বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ– ‘আজকে তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলের চাইতে

---

১১৯. আহমাদ হা/১৪৬৯৪ সনদ ছহীহ; হাকেম হা/৪২৫১, ২/৬২৪-২৫; আর-রাহীক্ব ১৫০ পৃ.; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবাহ ১১১ আয়াত।

উত্তম'।[১২০] ১৪০০ সাথীর মধ্যে মাত্র একজন বায়'আত করেনি। সে তার মূল্যবান লাল উটের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে কোন শাস্তি দেননি। বরং বলেন, –كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَّهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ 'তোমরা প্রত্যেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তবে লাল উটওয়ালা ব্যতীত' *(মুসলিম হা/২৭৮০ (১২)*।

ইমাম নববী বলেন, কাযী ইয়ায বলেন, 'লাল উটওয়ালা' বলে মদীনার জাদ বিন ক্বায়েস মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে *(শরহ মুসলিম)*। ইনি ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ শাখার নেতা *(ইবনু হিশাম ১/৪৬১)*। এই ব্যক্তি সহ একদল মুনাফিক ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের উপর কোন শাস্তি আরোপ করেননি। যদিও তারা ঈমানদারগণের নিকটে ছিল ধিকৃত এবং সর্বযুগে নিন্দিত। এযুগেও বিনা কারণে বায়'আত ভঙ্গকারীদের অবস্থা অনুরূপ হ'তে পারে।

(৪) আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর পথে 'মুরাবিত্ব' (الْمُرَابِط) অর্থাৎ 'সদা প্রস্তুত' থাকতে বলেছেন।[১২১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে সদা প্রস্তুত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার নেকী ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১২২] বিরোধীদের নানামুখী অপতৎপরতা মোকাবেলা করে আল্লাহ্র

---

১২০. মুসলিম হা/১৮৫৬ (৭১); বুখারী হা/৪১৫৪; মিশকাত হা/৬২১৯ 'মানাক্বিব' অধ্যায়, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

১২১. –يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও দৃঢ় থাক এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*।

১২২. كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ– 'প্রত্যেক মাইয়েত তার আমলের উপর মৃত্যুবরণ করবে 'মুরাবিত্ব' ব্যতীত। কেননা তার আমল ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের পরীক্ষা হ'তে নিরাপদ থাকবে' *(আবুদাঊদ হা/২৫০০; তিরমিযী হা/১৬২১ রাবী ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِّنَ الْفَزَعِ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় 'মুরাবিত্ব' অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার সৎকর্মের পুরস্কার ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখেন। তিনি ঐ ব্যক্তির উপর রিযিক জারি রাখেন এবং তাকে কবরের পরীক্ষা হ'তে নিরাপদ রাখেন। আর আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন উঠাবেন ভীতিহীন অবস্থায়' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৭; দ্র. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)*।

পথে সদা প্রস্তুত থাকতে গেলে প্রয়োজন তাদের সকল ঘাটে পাহারা বসানো। যা কখনো একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও নবীদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তবুও তাঁরাও সর্বদা ছাহাবীদের নিয়ে চলেছেন। আর তাদের নিয়েই ছিল জামা‘আত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) অবিশ্বাসীদের শত অত্যাচার ও অপবাদ সহ্য করেও জনগণের কাছে গিয়েছেন ও বায়‘আতের মাধ্যমে তাদেরকে জামা‘আতবদ্ধ করেছেন। অতএব আল্লাহ্র পথে সদা প্রস্তুত একটি নিবেদিতপ্রাণ দল সর্বদা থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) যাদেরকে ‘গোরাবা’ (অল্প সংখ্যক) এবং ‘মানছূরীন’ (বিজয়ী) বলে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।[১২৩] তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[১২৪]

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তাঁর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) এই দলকে ‘আহলুল হাদীছ’ বলেছেন *(তিরমিযী হা/২১৯২)*। ইয়াযীদ বিন হারূণ (১১৮-২১৭ হি.) ও আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِى مَنْ هُمْ؟ ‘যদি তাঁরা আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা’।[১২৫] আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন- আমীন!

---

১২৩. بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ– ‘ইসলাম শুরু হয়েছে অল্প সংখ্যক লোকদের মাধ্যমে। সত্বর তা অল্প সংখ্যক লোকদের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমন সূচনাতে ছিল। অতএব সুসংবাদ হ’ল ঐ অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য’ *(মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَلاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ– ‘আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে ক্বিয়ামত এসে যাবে’ *(তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩ রাবী মু‘আবিয়া বিন কুর্রাহ (রাঃ) তিনি তার পিতা হ’তে; ছহীহুল জামে‘ হা/৭০২)*।

১২৪. لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ– ‘চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে। অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’ *(মুসলিম হা/১৯২০ রাবী ছওবান (রাঃ)*।

১২৫. ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা; শারফু আছহাবিল হাদীছ ১৫ পৃ.।

আনুগত্যের গুরুত্ব

(أهمية الطاعة)

ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সেকারণ আনুগত্যহীন সংগঠন ইসলামে কাম্য নয়।

(১) আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلاً–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন। কিন্তু নেতার প্রতি আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فِي هَذَا إِشَارَةٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ الصَّائِرِ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ نَزَلَتْ فِي الْعُلَمَاءِ وَقَدْ رَجَّحَ ذَلِكَ أَيْضًا الطَّبَرِيُّ– 'উক্ত শিরোনাম রচনার মধ্যে ইমাম বুখারী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে 'নেতৃবৃন্দের' প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে। এটি তাদের কথার বিপরীত যারা বলেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে 'আলেম'দের

আনুগত্য সম্পর্কে। ইবনু জারীর ত্বাবারীও উক্ত বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন’। এর উদ্দেশ্য সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা।[১২৬] নইলে বহু আলেমের প্রতি বহু আনুগত্যের ফলে সমাজ বহুধা বিভক্ত ও বিশৃংখল হবে। তবে ফৎওয়া প্রদানের বিষয়টি আলাদা। যা প্রত্যেক যোগ্য আলেম যেকোন প্রশ্নকারীকে দিতে পারেন *(নাহ্ল ১৬/৪৩)*।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُّطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ، وَمَنْ يَّعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ، ‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[১২৭]

একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ– ‘যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[১২৮]

এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শিরক ও বিদ‘আতপন্থী বা ইসলাম বিরোধী সেক্যুলার কোন নেতা বা শাসক কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় ‘আমার আমীর’ (أَمِيرِى) নন। যদিও আল্লাহ্র বাধ্য ও অবাধ্য উভয় নেতাই নেতা। যেমন বাধ্য ও অবাধ্য উভয় সন্তানই পিতার সন্তান। কিন্তু কেবল বাধ্য সন্তানকেই পিতা বলেন, ‘আমার সন্তান’। আর সেই-ই পিতার সর্বাধিক স্নেহ লাভে ধন্য হয়। যেমন প্লাবনে ডুবন্ত অবাধ্য পুত্রকে বাঁচানোর আকুতির

---

১২৬. বুখারী, ফাৎহুল বারী ‘আহকাম’ অধ্যায়-৯৩, আল্লাহ্র বাণী ‘তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের’ অনুচ্ছেদ-১ এর আলোচনা হা/৭১৩৭-এর পূর্বে ১৩/১১১ পৃ.।

১২৭. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫ (৩২); মিশকাত হা/৩৬৬১ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২২৫-২৬ পৃ.।

১২৮. বুখারী হা/৭১৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫ (৩৩) ‘নেতৃত্ব’ অধ্যায়-৩৩।

জবাবে আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেন, إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، ‘সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অসৎ ব্যক্তি’ *(হূদ ১১/৪৬)*।

(৩) হারেছ আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يُّرَاجِعَ؛ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ–

‘আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি; আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) জামা‘আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা এবং (৫) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানালো, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ’ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম’।[১২৯] ‘যতক্ষণ না সে ফিরে আসে’ (إِلاَّ أَنْ يُّرَاجِعَ) অর্থ যতক্ষণ না সে পুনর্বিবেচনা করে ফিরে আসে। এটির মধ্যে বাবে মুফা‘আলার ‘মুবালাগা’ বা আধিক্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে *(মিরক্বাত)*।

(৪) তিনি বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَّ تُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا

১২৯. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২৩৩; শারহুস সুন্নাহ ৫/১৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৪; মিশকাত হা/৩৬৯৪ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮।

مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَه... 'তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে): (১) যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তার আমীরের অবাধ্য হ'ল। অতঃপর অবাধ্য অবস্থায় মারা গেল। (২) যে দাসী বা দাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল। (৩) যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত রয়েছেন। যিনি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যথাযথ ব্যবস্থা করেন। তারপরেও ঐ স্ত্রী তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়...'।[১৩০]

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ– 'আর তোমরা অবশ্যই আমীরের আনুগত্য করবে, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা মুমিন হ'ল নাকে লাগাম পরানো উটের ন্যায়। তাকে যেদিকে টানা হয়, সে সেদিকেই যায়'।[১৩১]

(৬) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ–

(ক) 'হে জনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর (খ) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (গ) রামাযানের ছিয়াম পালন কর (ঘ) তোমাদের সম্পদের যাকাত দাও (ঙ) তোমাদের নেতার আনুগত্য কর, তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর'।[১৩২] অত্র হাদীছে আমীরের আনুগত্যকে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদির ন্যায় ফরয ইবাদত সমূহের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং একে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে নেতার প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। যা সামাজিক শৃংখলার আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

---

১৩০. আহমাদ হা/২৩৯৮৮ রাবী ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ); ছহীহাহ হা/৫৪২।
১৩১. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।
১৩২. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৩৫; তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১; ছহীহাহ হা/৮৬৭।

উপরে বর্ণিত হাদীছগুলি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জামা'আতে 'আম্মাহ ও জামা'আতে খাছছাহ উভয় নেতার আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যতক্ষণ না সেখানে গোনাহের আদেশ থাকে।

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, 'বিদ্বানগণ আমীরের আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন, যেখানে কোন গোনাহ থাকে না'।[১৩৩]

জাহেলী হালতে মৃত্যু-র ব্যাখ্যা (شرح ميتة جاهلية) :

(১) ত্বীবী বলেন, اَلتَّمَسُّكَ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمَ الْخُرُوجِ عَنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْخُرُوجَ عَنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ هِجِّيرَى الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً- 'জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা এবং দল থেকে বের না হওয়াটা হ'ল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে দল থেকে বের হওয়াটা হ'ল জাহেলিয়াতের রীতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার (মুক্তির জন্য) কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে আমীরের বায়'আত নেই, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল' *(মিরক্বাত)*।[১৩৪]

(২) ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَالْمُرَادُ بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلاَلٍ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاعٌ- 'জাহেলী হালতে মৃত্যুর' অর্থ হ'ল জাহেলী যুগের লোকদের মৃত্যুর ন্যায়। যারা ভ্রষ্টতার উপরে ছিল এবং যাদের কোন অনুসরণীয় নেতা ছিল না'।[১৩৫]

---

১৩৩. আত্বিয়াহ বিন মুহাম্মাদ সালেম (মিসর : ১৩৪৬-১৪২০ হি./১৯২৭-১৯৯৯ খৃ.), শরহ আরবা'ঈন আন-নববিইয়াহ, ২৮তম হাদীছের ব্যাখ্যা, দরস ক্রমিক : ৬১, ৬ পৃ.।

১৩৪. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

১৩৫. ফাৎহুল বারী হা/৭০৫৩-এর ব্যাখ্যা 'ফিতান' অধ্যায়-৯২, ১৩/৭ পৃ.।

সুশৃংখল জামা‘আতী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يُّرَاجِعَ، ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে’।[১৩৬]

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ أَيْ نَقَضَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ– ‘ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল’ অর্থ ‘সে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করল ও দায়িত্ব ছিন্ন করল’ *(মিরক্বাত)*। এর মধ্যে বায়‘আত ভঙ্গ করার মন্দ পরিণতি বিবৃত হয়েছে।

জাহেলিয়াতের সংগঠন হ’তে বিরত থাকা আবশ্যক

(وجوب الامتناع عن المنظمات الجاهلية)

ইসলাম বিরোধী ও সেক্যুলার সংগঠনকে ‘জাহেলিয়াতের সংগঠন’ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ– ‘আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানালো, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ’ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম’ *(ঐ)*।

অতএব শিরক ও বিদ‘আতপন্থী সংগঠন এবং বস্তুবাদী ও সেক্যুলার কোন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও তার আনুগত্য করা সিদ্ধ নয়। তবে বাধ্যগত অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ، ‘তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্‌র নিকটে

১৩৬. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪; ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮, রাবী হারেছ আল-আশ‘আরী (রাঃ); মিরক্বাত; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৪।

চাও'।[১৩৭] তিনি বলেন, فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُم– 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে'।[১৩৮]

বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠনের আমীরের মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী না দেখা পর্যন্ত উক্ত সংগঠন ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা অথবা পৃথক সংগঠন করা কিংবা হক-বাতিল না বুঝে কোন দলে যোগ দান করা সিদ্ধ নয়। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ... 'যে ব্যক্তি আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক-বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট জ্ঞান নেই। সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়'...।[১৩৯]

এভাবে যারা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ– 'তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের পাপের বোঝা বহন করবে। আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

---

১৩৭. বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২ রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।
১৩৮. মুসলিম হা/১৮৪৬, মিশকাত হা/৩৬৭৩ রাবী ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ); বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'উদাত্ত আহ্বান' বই 'আন্দোলনের ধারা' অধ্যায়।
১৩৯. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

খালেছ ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কর্তব্য

(وجوب الدخول فى الجماعة الإسلامية الخالصة)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ ৭৩ ফের্কায় অর্থাৎ অসংখ্য দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে কেবল একটি দলই জান্নাতী হবে, যাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ– ‘আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে যারা দৃঢ় থাকবে’।[১৪০] তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে (১) ইয়াযীদ বিন হারূণ (১১৮-২১৭ হি.) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِى مَنْ هُمْ؟ ‘তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা’। ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন’।[১৪১] (২) স্পেনের বিশ্বখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হয্‌ম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ– ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীদের বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ’লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল ‘আম

১৪০. তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৩৪৮। অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ– হাকেম ১/২১৮, হা/৪৪৪; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৪৮৮৬, ৭৮৪০; হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৯৯।

১৪১. ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা; আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.), শারফু আছহাবিল হাদীছ (আংকারা, তুরস্ক : দার এহয়াউস সুন্নাহ আন-নববিইয়াহ, তাবি, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪০) হা/৪২, ২৬ পৃ.।

জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন![১৪২]

(৩) শায়েখ আব্দুল ক্বাদির জীলানী আল-বাগদাদী (রহঃ) বলেন, وَلاَ إِسْمَ لَهُمْ إِلاَّ إِسمٌ وَّاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ– 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। আর সেটি হ'ল 'আছহাবুল হাদীছ' (আহলুল হাদীছ)।[১৪৩]

ক্বিয়ামতের প্রাক্কাল অবধি এই দলের অস্তিত্ব থাকবে। যেমন হযরত ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَزَالُ طَائِـــفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَ هُمْ كَذَالِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[১৪৪]

অতএব কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী সংগঠনের আনুগত্য করতে হবে। এরূপ কোন সংগঠন দেশে থাকলে সেখানে যোগ দিয়ে জান-মাল ব্যয় করে তাকে শক্তিশালী করা মুমিনের কর্তব্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ– 'জামা'আত যত বড় হবে, সেটি আল্লাহ্র নিকট তত প্রিয় হবে'।[১৪৫] তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ–

১৪২. আলী ইবনু হয্ম (৩৮৪-৪৫৬ হি.), কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ. মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৩৮) 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়, ১/৩৭১ পৃ.।

১৪৩. আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.), কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর : ১৩৪৬ হি.) ১/৯০ পৃ.; ঐ (বৈরূত : ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/১৬৬ পৃ.।

১৪৪. মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়-৩৩, অনুচ্ছেদ-৫৩; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র. ঐ, দেউবন্দ ছাপা, শরহ নববী ২/১৪৩ পৃ.; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ 'ইল্ম' অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়-৯৬, অনুচ্ছেদ-১০; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা।

১৪৫. আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬ 'জামা'আতে ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-২৩, রাবী উবাই বিন কা'ব (রাঃ)।

‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হ’ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ’ল আযাব’।[১৪৬] আর একারণেই প্রবাদ রয়েছে, United we stand, divided we fall ‘ঐক্যে উত্থান, অনৈক্যে পতন’। নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ্‌র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল ইসলামী ইমারত বিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা। বস্তুতঃ জামা‘আতবদ্ধ জীবন মুমিনকে শক্তিশালী করে। তাতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

বায়‘আতের পদ্ধতি (كيفية البيعة) :

পুরুষের হাতে হাত রেখে বায়‘আত করাই সুন্নাত। তবে আমীরের নির্দেশনা মতে অন্যভাবেও বায়‘আত করা যায়। এমনকি পূর্ণ আনুগত্য থাকলে হাতে হাত রেখে বায়‘আত না করলেও চলে, যদি তাতে আমীরের সম্মতি থাকে। যেমন রাজধানী মদীনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত সারা দেশের মুসলিমগণ সবাই সরাসরি বায়‘আত করেননি। কিন্তু খলীফার প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য ছিল। ত্বায়েফ থেকে ছাক্বীফ গোত্রের জনৈক কুষ্ঠ রোগী বায়‘আত নিতে এলে রাসূল (ছাঃ) লোক পাঠিয়ে তাকে বলে দেন যে, তুমি ফিরে যাও। আমরা তোমার বায়‘আত নিয়েছি’ *(মুসলিম হা/২২৩১; মিশকাত হা/৪৫৮১)*। তিনি শিশু ও জ্বরাক্রান্ত রোগীদের বায়‘আত নেননি *(নাসাঈ ৪১৮৩, ৪১৮৫; ছহীহাহ হা/২১৭)*। বায়‘আতের জন্য নারীর হাতে হাত রাখা নিষিদ্ধ। কেবল (আড়াল থেকে) তাদের মৌখিক অঙ্গীকার ও সম্মতিই যথেষ্ট।[১৪৭] তাছাড়া সকলের পক্ষে একজন মহিলার মৌখিক বায়‘আত যথেষ্ট হবে।[১৪৮] যেখানে উদ্দেশ্য থাকবে স্রেফ আল্লাহ্‌র বিধান মানার অঙ্গীকার ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন।[১৪৯]

---

১৪৬. আহমাদ হা/১৮৪৭২ রাবী নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ); ছহীহাহ হা/৬৬৭।

১৪৭. বুখারী হা/৫২৮৮; মুসলিম হা/১৮৬৬; মিশকাত হা/৪০৪৫ ‘জিহাদ’ অধ্যায়-১৯, ‘সন্ধি’ অনুচ্ছেদ-৯, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

১৪৮. তিরমিযী হা/১৫৯৭; নাসাঈ হা/৪১৮১; ইবনু মাজাহ হা/২৮৭৫; মিশকাত হা/৪০৪৮ রাবী উমায়মাহ বিনতে রুক্বায়ক্বাহ (রাঃ)।

১৪৯. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘হোদায়বিয়ার সন্ধি’ অধ্যায়, ৪৪৫ পৃ. ও ‘মক্কা বিজয়’ অধ্যায় ‘জনগণের নিকট থেকে বায়‘আত গ্রহণ’ অনুচ্ছেদ, ৫৪৮ পৃ.।

নির্বাচন পদ্ধতি সমূহ পর্যালোচনা

(دراسة تحليلية عن طرق الانتخابات)

অছিয়ত ভিত্তিক, পরামর্শভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক চারটি নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম দু'টির সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্বাভাবিক। তৃতীয়টিতে যদি নেতা কোন দ্বীনদার যোগ্য ব্যক্তিকে পরবর্তী নেতা নিযুক্ত করেন, তাহ'লে ইসলাম তাকে সমর্থন দেয়। যেমন হযরত আবুবকর (রাঃ) করেছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-কে এবং উমাইয়া খলীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক (৯৬-৯৯ হি.) করেছিলেন স্বীয় ভাতীজা ওমর বিন আব্দুল আযীয-কে। হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) পিতার পরে পুত্র উভয়ে বাদশাহ ছিলেন।[১৫০]

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় আরব উপদ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ লাখের কাছাকাছি এবং ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ইসলামী খেলাফতের আয়তন ছিল ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাযার) বর্গমাইল।[১৫১] অথচ নেতৃত্ব নির্বাচন হয়েছিল কেবলমাত্র মদীনার দারুল খেলাফতে উপস্থিত উম্মতের সেরা কয়েকজন ছাহাবীর মাধ্যমে। অন্যদের এতে কোন ভূমিকা ছিল না সমর্থন করা ব্যতীত।

অতএব যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য যোগ্য নির্বাচক প্রয়োজন। যেটা পূর্বে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব। পূর্বতন নেতা যেকোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। ইবনু হযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন, প্রথমোক্ত পন্থা অর্থাৎ অছিয়তের পন্থাই আমাদের নিকট সবচেয়ে উত্তম। কেননা এর ফলে উম্মতের ঐক্য ও শৃংখলা বজায় থাকে। অন্য পন্থাগুলিতে উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হ'তে পারে এবং নেতৃত্বের লোভ ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিতে পারে'।[১৫২]

---

১৫০. বাক্বারাহ ২/২৫১; ছোয়াদ ৩৮/৩৫।
১৫১. খেলাফত ও জমহূরিইয়াত ৯২, ৮৬ পৃ.।
১৫২. ইবনু হযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ৩/৯৭ পৃ.।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলাম

(الانتخاب الديمقراطي والإسلام)

পূর্বে বর্ণিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির চতুর্থটি অর্থাৎ আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া এবং তার মাধ্যমে ইসলামী বিধান কায়েম হওয়া সম্ভব কি-না। আর ইসলামে এ পদ্ধতির অনুমোদন আছে কি-না এক্ষণে আমরা তা খতিয়ে দেখব।

ইসলামপন্থী দলগুলি সাধারণভাবে এই সুধারণা পোষণ করে থাকে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যতীত যেহেতু ইসলামী বিধান পূর্ণভাবে কায়েম হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার বাছাই করা সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। অতঃপর তারা নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে এসে ইসলামী বিধি-বিধান জারী করার ব্যবস্থা করবেন। চিন্তাটি বড়ই সাধু। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নিষ্করুণ! কেননা শুধু ইসলাম কেন কোন আদর্শবাদী জীবন ব্যবস্থাই জনগণের সার্বজনীন ভোটাভুটির মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরং এটাই বাস্তব যে, নবীগণ পৃথিবীর সেরা মানুষ হ'লেও তাঁরা কখনোই স্ব স্ব যুগের অধিকাংশ লোকের সমর্থন পাননি। তাই আজও অধিকাংশ লোকের সমর্থনে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির নেতা নির্বাচিত হওয়া কষ্ট-কল্পনা বৈ কিছুই নয়।

যদি মনে করা হয় যে, নির্বাচক ও নির্বাচন প্রার্থী উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী নির্ধারণ করে দিলে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই হয়ে আসবে। যেমন উভয়ে চোর, গুণ্ডা, সন্ত্রাসী, দাগী আসামী, ঋণখেলাপী, চোরাকারবারী, ঘুষখোর-সুদখোর ও বেঈমান হবে না। বরং উভয়কেই সৎ ও যোগ্য, ঈমানদার, আমানতদার ও মুত্তাক্বী হ'তে হবে ইত্যাদি। তবুও সঠিক নেতৃত্ব আসবে না। কারণ সবাই নিজেকে নেতা হবার যোগ্য মনে করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তার অধিকার রয়েছে বলে দাবী করে। আর এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক যুগে নেতৃত্বের মেয়াদী প্রথা। যাতে প্রতি মেয়াদ অন্তর নতুন নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ আসে। আর ঐ সুযোগ পাওয়ার জন্য সকলের মধ্যে সৃষ্টি হয় নেতৃত্ব পাওয়ার উন্মাদনা, যা তাকে পাগল করে

তোলে পরবর্তী নেতা হবার জন্য। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার সকল শক্তি ব্যয় করেন পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য। অন্যদিকে তার বিরোধীরা ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। আর এজন্য এমন কোন পাপ নেই, যা উভয়পক্ষ প্রকাশ্যে বা গোপনে করে না।

পন্থার ভিন্নতা : মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী পন্থায়। মানুষের মনগড়া কোন পন্থায় নয়। তাছাড়া আল্লাহ বলেন, মুশরিকরা নাপাক ব্যতীত নয়' *(তওবা ৯/২৮)*। অর্থাৎ তাদের আক্বীদা ও চিন্তাধারাটাই নাপাক। অতএব কোন আখেরাতশূন্য বস্তুবাদী মতবাদ মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের চলার পথ তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হ'ল দুনিয়া। আর আমাদের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হ'ল আখেরাত। মুমিন ক্ষমতা পেলে তা ব্যবহার করে আখেরাত লাভের জন্য। আখেরাত হারিয়ে সে দুনিয়া অর্জন করতে চায় না। তাই সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারই যথার্থ অনুসারী হ'তে হবে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যক্তিগত কুফল

(الآثار الضارة الفردية للانتخاب الديمقراطى)

(১) সে দু'হাতে নিজের বা দলের টাকা খরচ করে (২) সে নিজের গুণগান ও প্রতিপক্ষের চরিত্র হননে ব্যস্ত থাকে (৩) সে সমাজের ও সরকারের দুষ্টমতি লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যাতে স্বার্থপর ও হুজুগে লোকদের ভোট লাভে সক্ষম হয় (৪) সে যেকোন মূল্যে একটি ভোট হ'লেও তা বৃদ্ধির চেষ্টা করে এবং এর জন্য যেকোন অপকৌশল ও নোংরা পন্থা অবলম্বন করে বা করতে বাধ্য হয় (৫) নেতা হওয়ার অধিকার তারও আছে, এটা প্রকাশ করার জন্য সে প্রথমে মনোনয়ন প্রার্থী হয় ও যথারীতি মনোনয়নপত্র জমা দেয়। অতঃপর নিজে বা তার দলীয় কর্মীরা সর্বত্র মিটিং-মিছিল করে ও পোস্টার-বিজ্ঞাপন বিতরণ করে। দো'আ চাওয়ার নামে ভোট ভিক্ষা করে। এইভাবে নিজের বা দলের হাযার হাযার টাকা সে পানির মত খরচ করে। যার অধিকাংশ অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যদি সে

ভোটে হেরে যায়, তাহ'লে সব হারায়। আর যদি জিতে যায়, তাহ'লে তার প্রথম লক্ষ্য হয় ব্যয়কৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করা। এর জন্য যেকোন অপকৌশলের আশ্রয় নিতে সে পরোয়া করে না। শুধু তাই নয়, আগামীতে সম্ভাব্য নেতৃত্বকে সে খতম করতেও সচেষ্ট হয়। এগুলি হ'ল প্রচলিত নির্বাচন প্রথার ব্যক্তিগত ও দলীয় কুফল। এক্ষণে এর সামাজিক কুফল আমরা অবলোকন করব।-

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সামাজিক কুফল

(الآثار الضارة الاجتماعية للانتخاب الديمقراطى)

(১) যেহেতু নিজের বা দলীয় তহবিল ব্যতীত প্রচলিত নির্বাচনী যুদ্ধে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু জাতীয় সংসদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিপতিদের আধিপত্য কায়েম হয়। ফলে গরীবদের ভোট নিয়ে ধনীরাই সংসদ দখল করে এবং সমাজের সর্বত্র তারা অর্থনৈতিক শোষণ পাকাপোক্ত করার সুযোগ লাভ করে। ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের সঞ্চিত অর্থ দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ের নামে তারা যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনি ঋণখেলাপী হয়ে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এদের বিরুদ্ধে সরকারের কার্যতঃ কিছুই করার থাকে না। কেননা এরা নিজেরা সরকারে থাকে অথবা সরকারকে প্রভাবিত করে। তাই কি সরকারী দল, কি বিরোধী দল সবাই এদের বিরুদ্ধে চুপ থাকে। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত ছিল। আর বাংলাদেশ আমলে তা এখন ১৫৬ জনের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। যার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।[১৫৩] ফলে দেশের অর্থনীতি ক্রমেই পঙ্গু হ'তে চলেছে। ১৯৭৪

---

১৫৩. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত (মন্ত্রীত্বকাল : ২০০৯-২০১৮ খৃ.) এক প্রশ্নের উত্তরে জাতীয় সংসদে বলেন, তফসীলী ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কোটি টাকার হিসাবধারী রয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাযার ২৬৫ জন *(দৈনিক প্রথম আলো, ২৬শে জানুয়ারী ২০১৬)*। বর্তমানে নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। তাছাড়া সংসদে দেওয়া উক্ত হিসাবে মালয়েশিয়ায় সেকেণ্ড হোম ক্রয়কারী ও কালো টাকা পাচারকারীদের কোন হিসাব নেই।

সালের দুর্ভিক্ষে কিছু সংখ্যক দলনেতা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। অন্যদিকে হাযার হাযার বনু আদম না খেয়ে মরেছিল। আজও দেশে জাহেলী আরবের লোকদের ন্যায় পাঁচতলা ও গাছতলার বৈষম্য প্রকট হয়ে রয়েছে।[১৫৪] এমনকি পেটের দায়ে সন্তান বিক্রি করার ঘটনা অহরহ পত্রিকায় শিরোনাম হচ্ছে। অথচ স্বাধীন দেশে বিগত ৪৯ বছর যাবত গণতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে এবং জাতীয় সরকার থেকে শুরু করে উপযেলা ও গ্রাম সরকার পর্যন্ত সর্বত্র ভোটাভুটির মাধ্যমে নেতা নির্বাচিত হচ্ছেন। কিন্তু দেশ ক্রমে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। যদিও সরকারী মন্ত্রী-এমপিরা সর্বদা দেশকে উন্নয়নের 'রোল মডেল' বলে আত্মপ্রচার করেন।

(২) এই নির্বাচনী প্রথায় সরকারী ও বিরোধী দল থাকায় তাদের মধ্যে দলীয় বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হয়। যার প্রতিক্রিয়ায় সমাজে শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়। (৩) গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রথায় একাধিক ভোটপ্রার্থী থাকায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি অপরিহার্য হয়। নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা বিরাজ করে। সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। (৪) বহুদলীয় নির্বাচন প্রথায় অনেকগুলি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এমতাবস্থায় নির্বাচিত ব্যক্তি বা দলকে অন্য দল আন্ত রিকভাবে সমর্থন করে না। ফলে পরস্পরে সর্বদা শত্রুতার পরিবেশ অব্যাহত থাকে। (৫) দলীয় নির্বাচন প্রথা দলীয় অহংবোধ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে সরকারী দল ভাল কাজ করলেও বিরোধী দল চোখ বুঁজে থাকে বা তার অপব্যাখ্যা করে।

(৬) প্রচলিত প্রথায় সংসদ সদস্যদেরকে স্ব স্ব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। ফলে নির্বাচিত হওয়ার অহংকারে তিনি সর্বদা স্ফীত থাকেন। শত অযোগ্য বা দুর্নীতিগ্রস্ত হ'লেও দলনেতা বা প্রধানমন্ত্রী তাকে সরাতে পারেন না। কারণ তাতে নতুন নির্বাচনের ঝুঁকি তৈরী হয়, যা তিনি নিতে চাননা। ফলে পূর্ণ মেয়াদকাল অবধি জাতিকে এইসব এম.পি নামধারী

---

১৫৪. ২০১৮ সালে কিছু লোক অতি দ্রুত ধনী হওয়ার তালিকায় চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র সবাইকে টপকে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ম স্থানে পৌঁছে গেছে *(দৈনিক ইনকিলাব, ২১শে জুন ২০১৮)*।

লোকদের বোঝা টানতে হয়। এলাকার প্রশাসনে ও জননিরাপত্তা বিধানে এদের আইনতঃ কোন ভূমিকা না থাকলেও জনপ্রতিনিধি হওয়ার অহংকারে এরা সর্বদা প্রশাসনের উপর তাদের অবৈধ চাপ প্রয়োগ করেন। ফলে সুষ্ঠু প্রশাসন অনেকসময় বিঘ্নিত হয়।

(৭) এই প্রথায় নেতা নিরপেক্ষ ও সুস্থিরভাবে কাজ করতে পারেন না। কেননা তাকে সর্বদা বিরোধী দলের তোপের মুখে থাকতে হয়। যা তার বা তার দলের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত করে। অন্যদিকে নিজ দলের স্বার্থশিকারী, দুর্নীতিবাজ নেতা-কর্মী ও ক্যাডার নামধারী সন্ত্রাসীদের কাছে দলনেতাকে কার্যতঃ যিম্মী হয়ে থাকতে হয়। ফলে সমাজে তার ব্যাপক মন্দ প্রভাব পড়ে। (৮) এই ব্যবস্থায় সৎ-অসৎ, গুণী-নির্গুণ, নারী-পুরুষ সকলের ভোটের মূল্য সমান হওয়ায় 'হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর রাজ্যে তেল ও ঘিয়ের মূল্য সমান' হওয়ার ন্যায় সমাজে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ থাকে না। গুণীজনের কদর থাকে না। তথাকথিত সাম্যের নামে মানুষের সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়। (৯) এই ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করে ও যাকে খুশী তাকে নেতৃত্বে বসায়। অথচ মুসলিমগণ কেবল মুসলিম নেতার আদেশ মানতে বাধ্য *(নিসা ৪/১৪১)*। আর ইসলামী বিধান কেবল একজন ইসলামী নেতার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ফলে এই নির্বাচন ব্যবস্থা ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত বৈ কিছুই নয়। (১০) দল ও সরকার পৃথক হ'লেও গণতন্ত্রে সাধারণতঃ দলনেতাই রাষ্ট্রনেতা হন এবং এক সঙ্গে দুই পদ ধরে রাখেন। যা নিশ্চিতভাবে দেশকে দলীয়করণের নোংরা ড্রেনে নিক্ষেপ করে। ফলে দেশে দুঃশাসন কায়েম হয়।

সবশেষে বলা চলে যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

শূরার গুরুত্ব

(أهمية الشورى)

সাংগঠনিক ইমারত হৌক বা রাষ্ট্রীয় ইমারত হৌক, শূরার গুরুত্ব সবসময় বেশী। ‘আমীর’ তাঁর সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সর্বদা মজলিসে শূরা-র পরামর্শ নিবেন এটাই আল্লাহ্র হুকুম এবং এটাই হ’ল বৈষয়িক বিষয় সমূহে ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতি। যেমন-

(১) আল্লাহ বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

‘আর যরূরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

(২) ওমর ফারূক (রাঃ) ২৩ হিজরী সনে জীবনের শেষ হজ্জ পালন করার সময় মিনায় অবস্থানকালে লোকদের কিছু মন্তব্য তাঁর কানে আসে এই মর্মে যে, ওমর-এর মৃত্যু হ’লে আমরা অমুকের হাতে খলীফা হিসাবে বায়‘আত করব। একথা শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে জুম‘আর খুৎবায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমে বিবাহিত যেনাকার নারী-পুরুষদের রজমের বিষয়ে বলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পরে খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে ইতিপূর্বে শোনা কথার উপর মন্তব্য করে বলেন, مَنْ بَايَعَ رَجُلاً مِّنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُّقْتَلاَ- ‘যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কাউকে খলীফা হিসাবে বায়‘আত করবে, তার বায়‘আত সিদ্ধ হবে না। সে এবং তার হাতে বায়‘আতকারী উভয়ে নিজেদেরকে হত্যার শিকারে পরিণত করবে’ *(বুখারী হা/৬৮৩০)*। এখানে ‘মুসলমানদের সাথে পরামর্শ’ অর্থ ‘আহলে শূরা’ যারা পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য তাদের সাথে পরামর্শ।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি না করার। কেননা আবুবকর (রাঃ)-এর মত সর্বগুণ সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া সর্বযুগে সম্ভব নয়'।[১৫৫]

শূরা সদস্যগণকে অবশ্যই প্রথমে এক বা একাধিক যোগ্য নেতা বাছাই করতে হবে। অতঃপর জনসমর্থন যাচাই করতে হবে। যেমন ওছমান (রাঃ)-এর বেলায় করা হয়েছিল। জনসমর্থনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই শূরা সদস্যগণ একজনকে আমীর নির্বাচন করবেন। যদি দু'জন সমান যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে একজনের প্রতি জনসমর্থন বেশী হয়, তাহ'লে শূরা সদস্যগণ তাঁকেই 'আমীর' ঘোষণা করবেন। এভাবে সর্বাবস্থায় 'আমীর' নির্বাচনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক হবেন শূরা সদস্যগণ। ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিজস্ব আমলই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এমনিভাবে যেসব বিষয়ে শরী'আতের স্পষ্ট বিধান মওজুদ রয়েছে, সেগুলি বাদে কোন ইজতিহাদী বিষয়ে যখন শূরার পরামর্শ গ্রহণ করা হবে, তখন আমীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিবেন। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় গাত্বফান গোত্রের সাথে সন্ধির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবলমাত্র দু'জন সা'দ অর্থাৎ আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ-এর সাথে পরামর্শ করেন ও পরে নিজের মত পরিবর্তন করেন। জাতির সামগ্রিক স্বার্থের বিষয়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। যেমন বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধের সময়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। বিশেষ করে আনছারদের নিকট থেকে, যারা তাঁকে সাহায্য করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হিজরতের পূর্বে হজ্জের মৌসুমে মক্কায় তাঁর হাতে বায়'আত করেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি নিজের রায় বাদ দিয়ে ছাহাবীদের মতামত অনুযায়ী মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন।

এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শায়খান' অর্থাৎ হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতেন।

---

১৫৫. ফাৎহুল বারী হা/৬৮৩০-এর ব্যাখ্যা 'হুদূদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১, ১২/১৫৫ পৃ.।

এমনকি তিনি তাদের বলতেন, لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْ رَأْىٍ مَا خَالَفْتُكُمَا– ‘যদি তোমরা দু’জন কোন বিষয়ে একমত হও, তাহ’লে আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না’।[১৫৬]

জনমত যাচাইয়ের অর্থ এটা নয় যে, ‘আম’ জনগণ সবাই শূরা সদস্য এবং তাদের সকলের সমর্থন, অনুমতি ও ঐক্যমত ব্যতীত ‘আমীর’ নির্বাচন বা যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না, যেমনটি ধারণা করেছেন কোন কোন আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ।[১৫৭] এমনটিও নয় যে, প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ‘আমীর’ হবেন। যেমন গণতন্ত্রে যেকোন নাগরিকের একটি ভোটই নেতা হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়।[১৫৮] কারণ সেখানে পরামর্শের কোন সুযোগ নেই।

অতএব সর্বদা শূরার গুরুত্ব সর্বাধিক। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফত গ্রহণের অনুরোধ করা হ’লে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

لَيْسَ هَذَا لَكُمْ إِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَأَهْلِ الشُّوْرَى فَمَنْ رَضِيَ بِهِ أَهْلُ الشُّوْرَى وَأَهْلُ بَدْرٍ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ... ‘এটা তোমাদের কাজ নয়। বরং এটি বদরী ছাহাবী ও শূরা সদস্যদের দায়িত্ব। তাঁরা যাকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা হবেন’।[১৫৯]

---

১৫৬. আহমাদ ৪/২২৭, হা/১৮০২৩ সনদ যঈফ, রাবী আব্দুর রহমান বিন গানাম আল-আশ‘আরী (রাঃ); যঈফাহ হা/১০০৮; আশ-শূরা ৪৪ পৃ.।

১৫৭. أَهْلُ الشُّوْرَى هُمْ عُمُوْمُ النَّاسِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ سَيَتَعَلَّقُ بِعُمُوْمِهِمْ كَاخْتِيَارِ الْخَلِيْفَةِ وَإِعْلاَنِ الْحَرْبِ وَالْحَاكِمِ– দ্র. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আশ-শূরা ১০১ পৃ.।

১৫৮. যেমন বলা হয়, ওমা তোর একটি ভোটে অমুক... যাবে জিতে’। ১০৯ বছরের বুড়িকে ঝুড়িতে করে এনে তাকে ভোট দেওয়ানো হয়েছে। তাতে খুশী হয়ে আমেরিকার ২য় মেয়াদের বিজয়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা (২০১৩-২০১৭) তার বিজয়োত্তর স্টেট অফ দ্যা ইউনিয়ন তথা অভিষেক ভাষণে সেটি উল্লেখ করেন।

১৫৯. আশ-শূরা ১০৩ পৃ.; ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি.), আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ (বৈরূত : ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/৪৩ পৃ.।

বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব?

(كيف يمكن الانتخاب الإسلامى فى العصر الحالى؟)

বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ হ'ল তিনটি : বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ। এর মধ্যে বিচার ও শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান বিচারপতি মনোনয়ন দেন। অতঃপর তাঁর পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করেন। প্রধান সেনাপতি ও যেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ সমূহে তিনি নিয়োগ দেন। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ ইত্যাদি তাঁর হাতেই রয়েছে। তিনি এসব ব্যাপারে অধঃস্তনদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

বাকী থাকল আইনসভা বা জাতীয় সংসদ। এখানে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হন ও তারাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্টের নিকটে শপথ গ্রহণ করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকেই সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাঁর পরামর্শের বাইরে প্রেসিডেন্টের এমনকি বক্তৃতা করারও ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানটির অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগে বয়স, মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করা হ'লেও আইন সভার সদস্য নির্বাচনে সেগুলি যাচাই করা হয় না। কেবল ২৫ বছর বয়স হ'লেই চলে। অন্য দুই বিভাগে অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা থাকলেও এখানে কোন বয়ঃসীমা নেই। ফলে ২৫ বছরের তরুণ ও ৯৫ বছরের বৃদ্ধ এবং সর্বোচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ এবং অশিক্ষিত ও অদক্ষ সবাই একই সংসদে আইন প্রণেতার (?) আসনে বসেন। ফলে এটি একটি জগাখিচুড়ী সংসদে পরিণত হয়। মূলতঃ দলনেতার পক্ষে সমর্থন যোগানোই তাদের একমাত্র কর্তব্য হয়। এরপরেও বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদে

নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তার সংসদ সদস্য পদ বিলুপ্ত হয়।[১৬০] ফলে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কেউ দল বা দলনেতার বিপরীতে মত প্রকাশ করবে, এ যাবৎ এমন কাউকে দেখা যায়নি। ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদ ব্যতীত অন্যান্য নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হ'ত। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়েও দলীয়ভাবে নির্বাচন হচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে একই দলের 'স্বতন্ত্র' নামের বিদ্রোহী প্রার্থীদের উটকো বিড়ম্বনা। ফলে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ভাষাটি ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে ন্যায়বিচারও হারিয়ে যাচ্ছে।

উপরের চিত্র সামনে রেখে বর্তমান সময়ে নিম্নোক্ত উপায়ে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।-

---

১৬০. যেমন সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-
(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা
(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,
তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে' *(বাংলাদেশের সংবিধান ৫৫ পৃ.)*। এই কঠোর শর্তের মধ্যে কিসের ইঙ্গিত রয়েছে? উল্লেখ্য যে, উক্ত ধারা বাতিলের এখতিয়ার উচ্চ আদালতের নেই। যেমন ২০১৭ সালের ১৭ই এপ্রিল অনুচ্ছেদটি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়। কিন্তু আদালত তা খারিজ করে দেয় *(ঢাকা : দৈনিক কালের কণ্ঠ ১৯.০৩.২০১৮ ইং)*।

বর্তমান সময়ে দেশের আমীর নির্বাচন

(انتخاب الأمير العام فى العصر الحالى)

দেশের প্রেসিডেন্ট যিনি অবশ্যই একজন বিজ্ঞ মুসলিম ও সামর্থ্যবান পুরুষ হবেন, প্রথমে রাষ্ট্রের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হবেন এবং তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে একটি মজলিসে শূরা নিয়োগ দিবেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট যদি ইসলামী খেলাফতে বিশ্বাসী হন এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশ শাসনে প্রস্তুত থাকেন, তাহ'লে তিনিই 'আমীর' হবেন। নইলে 'শূরা' সদস্যদের সর্বসম্মত প্রস্তাবে অন্য একজন 'আমীর' হবেন। শূরা সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হ'লে তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত থাকবে এবং তা সর্বোচ্চ তিনদিনের মধ্যে অথবা সাধ্যমত দ্রুত সময়ের মধ্যে নিরসন করতে হবে এবং সকলকে একমত হ'তে হবে। এই তিন দিন পূর্বতন প্রেসিডেন্ট অথবা দেশের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। অতঃপর 'আমীর' নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি নতুনভাবে 'শূরা' গঠন করবেন এবং শূরা সদস্যদের 'বায়'আত' নিবেন। অন্যেরা তা মেনে নিবেন। আমীর মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে আল্লাহ্র বিধান মতে দেশ চালাবেন। যদিও তাঁদের পরামর্শ মানতে তিনি বাধ্য থাকবেন না। তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি একটি ছোট্ট কেবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

মোটকথা বর্তমানের বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের সাথে আইনসভা তথা পার্লামেন্ট সদস্য নিয়োগকেও আমীরের উপর ন্যস্ত করা হবে, জনগণের উপর নয়। ইসলামী শাসন ও নেতৃত্ব ব্যবস্থায় কেবল 'আমীর' নির্বাচিত হন, অন্যেরা নন।

মন্তব্য : সামষ্টিক নেতৃত্ব দুর্বল নেতৃত্বের শামিল। যা সামাজিক বিশৃংখলার অন্যতম প্রধান কারণ। 'ইসলাম' সর্বদা এককেন্দ্রিক শক্তিশালী নেতৃত্ব কামনা করে, যা সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান শর্ত।

সেকারণ জনৈক রাষ্ট্রনীতি বিশারদ পণ্ডিত বলেন, Best government is the least government. Least government is the best government. 'উত্তম সরকার হ'ল, ছোট সরকার। আর ছোট সরকার হ'ল উত্তম সরকার'। ২০০৭ সালের ১২ই জানুয়ারী থেকে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে ফখরুদ্দীন আহমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব দলীয় স্বার্থে মন্ত্রী-এমপি ও উপদেষ্টার বহর সৃষ্টি করা রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার মধ্যে কেউ ডিক্টেটরশিপ-এর গন্ধ পেলে তাকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের লালনভূমি বলে খ্যাত আমেরিকার কেবিনেট ব্যবস্থার দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। যেখানকার সদস্যবৃন্দ সকলেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হন এবং তারা প্রেসিডেন্ট-এর নিকট দায়ী থাকেন। সেকারণ বলা হয়, 'আমেরিকার কেবিনেট প্রেসিডেন্টের ইচ্ছারই সৃষ্টি'।[১৬১] সেখানকার প্রেসিডেন্ট অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। অধ্যাপক স্ট্রং বলেন, বর্তমান পৃথিবীর কোন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত কোন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি দেখা যায় না' *(ঐ, ৭১০ পৃ.)*। কেউ স্বীকার করুন বা না করুন, প্রেসিডেন্ট শাসিত হৌক বা প্রধানমন্ত্রী শাসিত হৌক কথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে একইরূপ জবর দখলকারী শাসন চলছে। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী *(ছহীহাহ হা/৫)*। সর্বত্র মানুষকে মানুষের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং শোষণ ও অবিচারে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এখন প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যেটা হ'ল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য।

আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য (مسؤوليات الأمير وواجباته) :

আমীরের প্রধান দায়িত্ব হ'ল সংগঠনে বা রাষ্ট্রে ন্যায়ের আদেশ বা অন্যায়ের নিষেধ নীতি বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা। আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

১৬১. ড. এমাজউদ্দীন আহমাদ (১৯৩৩-২০২০ খৃ.), রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (ঢাকা : ১৯৬৪ খৃ.) ৭১৫ পৃ.।

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ– ‘তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ’লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন’ *(হজ্জ ২২/৪১)*।

(২) হযরত উম্মুল হুছাইন *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)* বলেন, বিদায় হজ্জের সময় বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর প্রদত্ত ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُّجَدَّعٌ اَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا– ‘যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর’।[১৬২] অর্থাৎ আমীরের প্রধান কর্তব্য হ’ল আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী সংগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

(৩) হযরত মা‘ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ؛ وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ؛ وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ : فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ– ‘আল্লাহ যখন মুসলমানদের উপর বা লোকদের উপর তার কোন বান্দাকে নেতৃত্ব সমর্পণ করেন, অতঃপর সে নির্দিষ্ট দিনে মৃত্যু বরণ করে তার অধীনস্তদের সাথে খেয়ানতকারী অবস্থায়, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন’। একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘উপদেশের মাধ্যমে তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[১৬৩]

---

১৬২. মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮।

১৬৩. বুখারী হা/৭১৫১, ৭১৫০; মুসলিম হা/১৪২ ‘ঈমান’ অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ-৩৭; মিশকাত হা/৩৬৮৬-৮৭ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮।

(৪) খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৩ খৃ.) বলতেন, لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً لَظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلِي عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি বকরীর বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি বিশ্বাস করি যে, সেজন্য আল্লাহ আমাকে ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন'।[১৬৪] অর্থাৎ শাসক প্রজাসাধারণের দ্বীন ও দুনিয়ার পাহারাদার হবেন।

আনুগত্যের পরিধি (نطاق الطاعة) :

আনুগত্যের পরিধি হ'ল যতক্ষণ না গোনাহের আদেশ দেওয়া হয়। যেমন,

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ– 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর পসন্দে বা অপসন্দে আমীরের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না গোনাহের আদেশ দেওয়া হয়। গোনাহের আদেশ দেওয়া হ'লে তা শোনা বা মান্য করা যাবে না'।[১৬৫]

(২) তিনি বলেন,

أَلاَ مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِّنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ– وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ : وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ–

---

১৬৪. আবু নু'আইম ইস্ফাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪০৯ হি., ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪,২২৭) ১/৫৩, ৬/১৩৭ পৃ.; অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَوْ مَاتَتْ سَخْلَةٌ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ضَيْعَةً لَخِفْتُ أَنْ أُسْأَلَ عَنْهَا– 'যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি বকরীর বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি ভয় পাই যে, সেজন্য আমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫; সনদ 'ছহীহ লিগায়রিহী')*।

১৬৫. বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়-১৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

‘সাবধান! তোমাদের শাসকের কোন গোনাহের কাজ দেখলে ঐ কাজটিকে অপসন্দ কর। কিন্তু তার থেকে অবশ্যই আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না’। একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের কোন কাজ দেখ যা তোমরা অপসন্দ কর, তখন তোমরা তার কাজকে অপসন্দ কর। কিন্তু তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিয়ো না’।[১৬৬]

(৩) হযরত ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ : وَعَلَى أَنْ لاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ-

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এই মর্মে বায়‘আত করলাম যে, কষ্টে ও স্বচ্ছলতায়, পসন্দে ও অপসন্দে এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া অবস্থায় আমরা তাঁর আনুগত্য করব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না। আর আমরা সত্য কথা বলব যেখানেই থাকিনা কেন? আমরা আল্লাহ্র জন্য কথা বলতে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আর আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না। যতক্ষণ না তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে’।[১৬৭] অর্থাৎ মুসলিম আমীরগণের মধ্যে প্রমাণ সহ স্পষ্ট কুফরী না দেখা পর্যন্ত তাদের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) ছিলেন আক্বাবার ২য় বায়‘আতে ১২ জনের অন্যতম সদস্য *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২০২ পৃ.)*।

১৬৬. মুসলিম হা/১৮৫৫ (৬৫-৬৬); মিশকাত হা/৩৬৭০ রাবী ‘আওফ বিন মালেক আল-আশজা‘ঈ (রাঃ)।
১৬৭. বুখারী হা/৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/৩৬৬৬।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَّنْ رَّضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوْا : أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : لاَ مَا صَلَّوْا، لاَ مَا صَلَّوْا– 'তোমাদের মধ্যে অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ তোমরা মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সে মন্দ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসারী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, তখন কি আমরা ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে'।[১৬৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ– 'না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখে। না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখে' *(মুসলিম হা/১৮৫৫ (৬৬)*।

(৫) তিনি স্পষ্ট করে বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الخَالِقِ– 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।[১৬৯] তিনি বলেন, لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ– 'গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায়ের কাজে'।[১৭০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ 'যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৬৭ রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)*। অতএব নেতাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র অনুগত থাকতে হবে।

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেছেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا

১৬৮. শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৯; মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১ রাবী উম্মু সালামাহ (রাঃ)।
১৬৯. শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৫; আহমাদ হা/১০৯৫; মিশকাত হা/৩৬৯৬, রাবী নাউয়াস বিন সাম'আন (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০ ।
১৭০. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫ রাবী আলী (রাঃ)।

رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ– ‘সত্বর আমার পরে তোমরা স্বার্থপর শাসকদের দেখবে এবং এমন কাজ সমূহ দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন আমরা কি করব? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্‌র নিকটে চাও’।[১৭১]

(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ...تَسْمَعُ وَتُطِيعُ الْأَمِيرَ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ– ‘তুমি মুসলমানদের জামা‘আত এবং তাদের নেতাকে আঁকড়ে ধর’...তুমি আমীরের কথা শোন ও তার আনুগত্য কর। যদি তিনি তোমার পিঠে মারেন ও তোমার মাল নিয়ে নেন, তবুও তুমি তার কথা শোন ও মান্য কর’।[১৭২]

(৮) তিনি বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– ‘যে ব্যক্তি তার আমীরের নিকট থেকে অপসন্দনীয় কিছু দেখল, সে যেন তাতে ছবর করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ পৃথক হ’ল, অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[১৭৩]

(৯) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন স্থানে আনছারদের জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এক সময় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তার সেনাদলকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দেন। তখন একদল তাতে প্রবেশ করার সংকল্প করল। অপর দল একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছিলাম’। তখন আমীরের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে

১৭১. বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮।
১৭২. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২ ‘ফিৎনা সমূহ’ অধ্যায়-২৭, রাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)।
১৭৩. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮ রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

আগুন নিভে যায়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বলা হ'লে তিনি বলেন, -لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহ'লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ- 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে'।[১৭৪] ইমাম নববী বলেন, এটি আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ্র ঘটনা নয়। বরং পৃথক ঘটনা *(মুসলিম হা/১৮৪০-এর ব্যাখ্যা)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত' এর অর্থ 'যদি তারা আমীরের নির্দেশ মান্য করার জন্য এটাকে হালাল ভেবে করত, তাহ'লে তারা সেখান থেকে আর কখনো বের হ'তে পারত না'। যারা আগুনে প্রবেশ করেনি, তাদেরকে রাসূল (ছাঃ) উত্তম কথা বলেন ও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কারো প্রতি আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল বৈধ কর্মে' *(ফাৎহুল বারী হা/৪০৮৫-এর ব্যাখ্য)*। উপরোক্ত ঘটনায় আমীরের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেই সাথে উক্ত আনুগত্যের পরিধিও জানা যায়।[১৭৫]

আত্মঘাতী হওয়া যাবে না : ইসলামী জিহাদের চিরন্তন বিধান পাওয়া যায় এই মর্মে যে, আমীরের নির্দেশে আত্মঘাতী হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, -وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা হোনায়েন যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম *(বুখারী হা/৪২০৪)*। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথীদের মধ্যে একজনকে ইঙ্গিত করে বললেন, هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ 'এই ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসী'। কেউ কেউ বিষয়টিতে সন্দেহ প্রকাশ করছিল। অতঃপর কঠিন

---

১৭৪. মুসলিম হা/১৮৪০ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়-৩৩; বুখারী হা/৭১৪৫, ৭২৫৭; যাদুল মা'আদ ৩/৪৫০-৫১।

১৭৫. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৮২ পৃ. সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজাযযিয আল-মুদলেজী ক্রমিক-৮৭।

যুদ্ধ শুরু হয় এবং ঐ ব্যক্তি যখমে জর্জরিত হয়। এক পর্যায়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ব্যক্তিটি নিজের তীর বের করে আত্মহত্যা করে। তখন লোকেরা এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলে, صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، انْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ‘আল্লাহ আপনার কথা সত্য প্রমাণ করেছেন। অমুক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে’ *(বুখারী হা/৪২০৩)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ– ‘আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং লোকদের ডাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে না মুসলিম ব্যতীত এবং নিশ্চয় আল্লাহ এই দিনকে সাহায্য করবেন ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে দিয়ে’ *(বুখারী হা/৩০৬২)*।

প্রেসিডেন্ট ও আমীরের মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين الرئيس والأمير) :

বর্তমান যুগের প্রেসিডেন্টগণের সাথে ‘আমীর’-এর পার্থক্য এই যে, (১) ‘আমীর’ আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে কোন বিধান জারী করতে পারবেন না এবং অহি-র বিধান জারী করতে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের বাইরে কিছুই করতে পারেন না। অন্যদিকে ‘প্রেসিডেন্ট’ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছাচারী হ’তে পারেন ও যেকোন আইন জারী করতে পারেন। (২) ইসলামী ব্যবস্থায় ‘আমীর’ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আইন জারী করতে বাধ্য। তিনি স্বেচ্ছাচারী হ’তে পারেন না। তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট এবং মজলিসে শূরা ও জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন, যা Check and Balance-এর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে কাজ করে।

আমীরকে বাধ্য করা যাবেনা (لا يُكرَه الأميرُ) :

(১) মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ শেষে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিজস্ব প্রজ্ঞা মতে সিদ্ধান্ত নিবেন। আল্লাহ বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

‘আর যরূরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

যেমন ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাজির ও আনছার নেতৃবৃন্দের পরামর্শ বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে নিজের দেখা একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। অতঃপর তিনি বলেন, যদি আমরা মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করতাম! তাহ’লে যদি তারা আমাদের উপর হামলা করে, তবে আমরা এখানে থেকেই তাদের প্রতিরোধ করতে পারতাম’। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! জাহেলী যুগে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। তাহ’লে ইসলামী যুগে কিভাবে তারা আমাদের এখানে প্রবেশ করবে? রাবী ‘আফফান বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, বেশ তোমাদের ইচ্ছা। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বর্ম ও অস্ত্র সজ্জিত হ’লেন। তিনি বলেন, তখন আনছারগণ বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছি। অতঃপর তারা এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি যেটা বললেন সেটাই হৌক। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন নবীর জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, যুদ্ধের পোষাক পরিধানের পর তিনি তা খুলে ফেলেন, যুদ্ধ না করা পর্যন্ত’।[১৭৬]

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ ও তা মেনে নেওয়া আমীরের জন্য সঙ্গত। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করা যাবে না। বরং তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। তবে বিধানগত বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বাইরে অধিকাংশের রায় মেনে নেওয়া বৈধ নয়’ *(আন‘আম ৬/১১৫-১১৬)*।

(২) যাকাত জমা করতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যখন যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ওমর (রাঃ) বলেন,

---

১৭৬. আহমাদ হা/১৪৮২৯, সনদ ছহীহ লেগায়রিহী-আরনাঊত্ব; ফাৎহুল বারী হা/৭০৩৫-এর আলোচনা; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৪১-৪৩ পৃ.।

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِّلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-

‘কিভাবে আপনি লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি লোকদের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলি করবে, তখন আমার পক্ষ হ’তে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল’। তখন আবুবকর বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহ্র কসম! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চাও আমাকে না দেয়, যা তারা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদান করত, তাহ’লেও আমি তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ওমর বললেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ যুদ্ধের জন্য আবুবকরের হৃদয়কে খুলে দিয়েছেন। অতঃপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটাই সত্য’।[১৭৭]

শূরা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য (مسؤوليات أهل الشورى وواجباتهم) :

(১) মজলিসে শূরার সদস্যগণ পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহভীরুতা বজায় রেখে আমীরকে পরামর্শ দিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

১৭৭. বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০ ‘যাকাত’ অধ্যায়-৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ-

‘আল্লাহ যখন কোন আমীরের কল্যাণ চান, তখন তিনি তার জন্য সৎ ও যোগ্য পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। যদি আমীর কোন বিষয়ে ভুলে যান, তাহ’লে তারা তাঁকে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমীর স্মরণ করলে তারা তাঁকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ তার ব্যাপারে অন্য কিছু চান, তাহ’লে তিনি তার জন্য মন্দ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। যদি তিনি ভুলে যান, তাহ’লে তারা তাকে স্মরণ করায় না। আর তিনি স্মরণ করলে তারা তাকে সাহায্য করে না’।[১৭৮]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

‘আল্লাহ যখন কোন নবী প্রেরণ করেন বা কোন খলীফা নির্বাচিত করেন, তখন তার জন্য দু’জন অন্তরঙ্গ নিযুক্ত করেন। একজন তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও ভালোর প্রতি উৎসাহিত করে। অন্যজন তাকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দের দিকে প্ররোচিত করে। আর রক্ষা পান কেবল তিনি, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন।[১৭৯] এজন্য আমীরকে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে হবে ও উত্তম পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) শূরা সদস্যগণ সর্বদা আমীরকে সৎপরামর্শ দিবেন এবং পরামর্শের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আবুল হায়ছাম

১৭৮. আবুদাঊদ হা/২৯৩২; নাসাঈ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৩৭০৭ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
১৭৯. বুখারী হা/৭১৯৮; মিশকাত হা/৩৬৯১, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

ইবনু তাইয়িহান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বললেন, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার নিকট গোলাম আসলে তুমি আসবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দু'টি গোলাম আনা হ'ল। তখন আবুল হায়ছাম তার নিকটে এলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়ে যাও! তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার জন্য একটা বেছে দিন। তখন তিনি বললেন, إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ– 'নিশ্চয় যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে আমানতদার হ'তে হয়'। তুমি এই গোলামটিকে নাও। আমি তাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তুমি তার সাথে সদাচরণ করবে'।[১৮০]

এতে বুঝা গেল যে, সৎপরামর্শ একটি আমানত। যার গোপনীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ– 'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রাখে, তুমি তার আমানত যথাযথভাবে আদায় কর। আর যে ব্যক্তি তোমার খেয়ানত করে, তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না'।[১৮১] এখানে শূরা সদস্যদের নিকটে আমীরের পক্ষ থেকে ও অধীনস্ত সকলের পক্ষ থেকে সুপরামর্শ দানের আমানত রয়েছে। অতএব এর গুরুত্ব সর্বাধিক। নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও এতে খেয়ানত করা যাবে না।

বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য (مسؤوليات القضاة وواجباهم) :

বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকবেন। তাঁরাই হ'লেন সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রতীক। ন্যায়বিচারকের মর্যাদা দুনিয়া ও আখেরাতে তুলনাহীন। আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ، وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا، اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا

১৮০. তিরমিযী হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৫০৬২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৮১. তিরমিযী হা/১২৬৪; আবুদাঊদ হা/৩৫৩৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৯৩৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

تَعْمَلُونَ– ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(নিসা ৪/১৩৫)*।[১৮২]

বিচারক তিন প্রকার (القضاة ثلاثة) :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

---

১৮২. এটি ইসলামী বিচার ব্যবস্থার একটি চিরন্তন বিধান। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যের বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৬৩৬ খৃ.)-এর আইন বিভাগের গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বারে ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ বাণী হিসাবে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৩৫ আয়াতটি ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(দৈনিক ইনকিলাব ৬ই জানুয়ারী ২০২০ পৃ. ৬)*। নিঃসন্দেহে এটি অমুসলিমদের নিকট কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে ২০১৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার গভীর রাতে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসাবে গ্রীক দেবী থেমিসের ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সেটি ৫ মাস ৬ দিন পর ২০১৭ সালের ২৬শে মে সুপ্রীম কোর্টের বর্ধিত (অ্যানেক্স) ভবনের সামনে নিয়ে পুনঃস্থাপন করা হয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয় 'মূর্তি অপসারণ ও পুনঃস্থাপন' জুলাই ২০১৭, ২০/১০ সংখ্যা)*।

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ– ‘বিচারক তিন প্রকার। একপ্রকার জান্নাতী এবং অপর দু’প্রকার জাহান্নামী। জান্নাতী হ’ল সেই বিচারক, যে সত্যকে জেনে-বুঝে তদনুযায়ী ফায়ছালা দেয়। আর জাহান্নামী হ’ল সেই বিচারক, যে সত্যকে জানার পর অন্যায় বিচার করে। আর যে বিচারক অজ্ঞতাবশে ফায়ছালা দেয়, সেও জাহান্নামী’।[১৮৩]

(২) তিনি বলেন, مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ– ‘যে ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে বিচারক নিযুক্ত করা হ’ল, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ করা হ’ল’।[১৮৪] কারণ এজন্য তাকে তার যাবতীয় অনুরাগ ও বিরাগকে যবেহ করতে হয় *(মিরক্বাত)*।

(৩) তিনি আরও বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ বিচারকের সঙ্গে থাকেন, যতক্ষণ না সে অবিচার করে। কিন্তু যখন সে অবিচার করে, তখন আল্লাহ তার থেকে সরে যান ও শয়তান তার সহচর হয়’।[১৮৫]

ন্যায়বিচারকদের মর্যাদা (فضل المقسطين) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوْا– ‘ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারকগণ মহান আল্লাহ্র ডানপার্শ্বে নূরের

---

১৮৩. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৩৭৩৫ রাবী বুরায়দা আসলামী (রাঃ)।

১৮৪. আহমাদ হা/৭১৪৫; আবুদাঊদ হা/৩৫৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৩০৮; মিশকাত হা/৩৭৩৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৮৫. তিরমিযী হা/১৩৩০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১২; হাকেম হা/৭০২৬; মিশকাত হা/৩৭৪১ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ)।

আসন সমূহে উপবেশন করবে। আর আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত। ন্যায়পরায়ণ হ'ল ঐ সব ব্যক্তি যারা তাদের শাসনে, পরিবারে ও তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমূহে ন্যায়বিচার করে'।[১৮৬]

কাযী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার (عدالة القاضى شريح) :

কাযী শুরাইহ বিন হারেছ আল-কিন্দী (মৃ. ৭৮ হি.) ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার মানদণ্ডে একজন অনন্যসাধারণ বিচারপতি ছিলেন। তিনি খলীফা ওমর, ওছমান, আলী এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকাল অবধি দীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নিরপেক্ষ বিচারের দু'টি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

(ক) খলীফা ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। অতঃপর তার পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু কিছু দূর যেতেই ঘোড়াটি খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। তখন তিনি বিক্রেতার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, তুমি ঘোড়াটি ফিরিয়ে নাও, কেননা এটি ত্রুটিযুক্ত। বিক্রেতা বলল, আমি ঘোড়াটি ফেরত নেব না। খলীফা বললেন, তাহ'লে তোমার ও আমার মাঝে একজন বিচারক নির্ধারণ করা হোক। বিক্রেতা বলল, বেশ তাহ'লে শুরাইহ। খলীফা বললেন, তিনি কে? বিক্রেতা বলল, তিনি ইরাকের অধিবাসী।

অতঃপর তারা উভয়ে শুরাইহ্‌র নিকট গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুরাইহ ঘোড়ার মালিকের বক্তব্য শুনে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যে অবস্থায় ঘোড়াটি নিয়েছিলেন সে অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে দিন। অথবা যা ক্রয় করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হৌন'। ওমর (রাঃ) বললেন, এটি ব্যতীত ন্যায়বিচার হ'তে পারে কি? আপনি কূফায় চলুন। আমি আপনাকে কূফার বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দিলাম।[১৮৭] অর্থাৎ ঘোড়াটি ক্রয়ের সময় সে সুস্থ ছিল। পরে খুঁড়িয়ে চললে সেজন্য বিক্রেতা দায়ী নয়। অতএব ক্রয়-বিক্রয় শেষ হবার আগেই ভালভাবে যাচাই করা আবশ্যক ছিল।

---

১৮৬. মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০ রাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)।
১৮৭. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২৫ পৃ.।

(খ) খলীফা আলী (রাঃ) একদিন বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খৃষ্টান একটি লোহার বর্ম বিক্রি করছে। সেটা দেখে তিনি তাঁর হারানো বর্মটি চিনে ফেলেন এবং বলেন, এ তো আমার বর্ম। চল, তোমার ও আমার মধ্যে মুসলমানদের বিচারকের নিকট ফায়ছালা হবে। অতঃপর যখন কাযী শুরাইহ আমীরুল মুমিনীনকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি তার বসার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন ও খলীফাকে তার স্থানে বসালেন। আর নিজে তাঁর সম্মুখে খৃষ্টান বিবাদীর পাশে বসলেন। আলী (রাঃ) বিচারপতি শুরাইহকে বললেন, হে শুরাইহ! যদি আমার বিবাদী মুসলিম হ'ত, তাহ'লে আমি তার পাশে বসতাম। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা ইহূদী-নাছারাদের সাথে মুছাফাহা করোনা ও তাদেরকে আগে সালাম দিয়োনা। তোমরা তাদের রোগীদের সেবা করোনা ও তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করোনা। তোমরা তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ স্থানে যেতে বাধ্য কর এবং তাদেরকে অপদস্থ কর, যেমন আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছেন' *(বায়হাক্বী হা/১৯১৯৫; মুসলিম হা/২১৬৭)*। এক্ষণে হে শুরাইহ! আপনি আমার ও তার মধ্যে বিচার করুন।

শুরাইহ বললেন, হে খলীফা! আপনি আপনার কথা বলুন। খলীফা বললেন, এটি আমার বর্ম। যা বেশ কিছুদিন পূর্বে হারিয়ে গিয়েছিল'। এবার তিনি বিবাদী খৃষ্টানকে বললেন, তুমি কি বলতে চাও! সে বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদী বলব না। তবে এটি আমার বর্ম'। তখন শুরাইহ খলীফাকে বললেন, আপনার কোন সাক্ষী আছে কি? আলী বললেন, শুরাইহ সঠিক বলেছেন (কারণ সাক্ষী ব্যতীত বিচার হয় না)। তখন খৃষ্টানটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটাই হ'ল নবীগণের রীতি। আমীরুল মুমিনীন নিজেই বিচারকের নিকটে আসেন এবং বিচারক তার বিরুদ্ধে ফয়ছালা দেন। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র কসম। এটি আপনার বর্ম। ...যা আপনার উট থেকে পড়ে গিয়েছিল। পরে আমি সেটি কুড়িয়ে নেই। অতএব আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। তখন আলী (রাঃ) বললেন, যেহেতু তুমি মুসলমান হয়েছ, এখন এটি তোমার। অতঃপর তিনি তাকে একটি উত্তম ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে বিদায় দেন'।

রাবী জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ইমাম শা'বী (২১-১২৩ হি.) বলেন, আমি পরবর্তীকালে তাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, এছাড়াও আলী (রাঃ) তার জন্য দু'হাযার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দেন। অবশেষে এই ব্যক্তি ছিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে লড়াই করে শহীদ হন।[১৮৮]

উপরের দৃষ্টান্ত সমূহে বুঝা যায় যে, ইসলামী খেলাফতে দেশের বিচার বিভাগ সর্বদা স্বাধীন থাকবে এবং সেখানে ইসলামী বিধান মতে বিচার হবে। 'আমীর' বা যেকোন সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। এমনকি আমীর নিজেই আদালতে হাযির হবেন।

আমীরের অব্যাহতি (معزولية الأمير) :

আমীরের বিরুদ্ধে আদালতে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করলে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এবং মজলিসে শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে 'আমীর' যেকোন সময় অপসারিত হবেন। অতঃপর শূরার মাধ্যমে 'নতুন আমীর' নিযুক্ত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারত-এর যোগ্য থাকা অবধি বা মৃত্যু অবধি তিনি ঐ পদে বহাল থাকবেন। ইসলামী খলীফাগণের দৃষ্টান্ত তার বাস্তব দলীল।

আমীরের উত্তরাধিকারী (وارث الأمير) :

'আমীর'-এর মৃত্যু হ'লে তাঁর অছিয়ত বা মনোনয়ন মোতাবেক পরবর্তী আমীর নিযুক্ত হবেন। কিংবা তাঁর অথবা 'শূরা' নিয়োজিত একটি ছোট সাব কমিটি এ দায়িত্ব পালন করবে। যারা অবশ্যই বিচক্ষণ ও শারঈ জ্ঞানে অভিজ্ঞ হবেন। অতঃপর শূরা সদস্যগণ সার্বিক বিবেচনায় একজনকে 'আমীর' নির্বাচন করবেন। অতঃপর নিযুক্ত আমীরকে সকলে মেনে নিবেন। নতুন 'আমীর' পুনরায় 'শূরা' গঠন করবেন। তাদের আনুগত্যের বায়'আত নিবেন ও তাদের পরামর্শ মোতাবেক দেশ চালাবেন।

---

১৮৮. বায়হাক্বী ১০/১৩৬, হা/২০৯৬৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৮/৫ পৃ.।

আমীর ও জনগণ (الأمير والعوام) :

আমীর হবেন জনগণের খাদেম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তার কোন বান্দাকে যদি লোকদের উপরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তাদের উপর খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যু বরণ করে, তাহ'লে তার উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[১৮৯] কেবল শাসকই নন, বরং যেকোন দায়িত্বশীলের জন্য একই হুকুম।

দায়িত্বশীলতার কিছু নমুনা

(بعض النماذج فى المسؤولية)

(১) ২য় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন প্রচণ্ড খরতাপে ছাদাক্বার উট সমূহের পরিচর্যা করছিলেন। এমন সময় বনু তামীমের নেতা আহনাফ বিন ক্বায়েস ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আসেন। যখন তারা নিকটবর্তী হ'লেন, তখন খলীফা আহনাফকে ডেকে বললেন, হে আহনাফ! শীঘ্র কাপড়-চোপড় ছেড়ে চলে এস! উট পরিচর্যার কাজে আমীরুল মুমিনীনকে সাহায্য কর। কেননা এগুলি ছাদাক্বার উট। এর মধ্যে ইয়াতীম-মিসকীন ও বিধবাদের হক রয়েছে। তখন একজন বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি ছাদাক্বা খাতের কোন একজন গোলামকে এ কাজের নির্দেশ দিলেই তো যথেষ্ট ছিল। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, আমার চাইতে ও আহনাফের চাইতে বড় গোলাম আর কে আছে? কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন দায়িত্বে থাকে, তার উপরে ঐভাবে দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব, যেভাবে একজন মনিবের প্রতি গোলামের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব'।[১৯০]

(২) ক্বিয়ামতের দিন ওযনের পাল্লা হালকা হওয়ার ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) বলতে গেলে ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন, যদি আমি রাতে অধিক ঘুমাই, তাহ'লে আমি নিজেকে ধ্বংস

১৮৯. বুখারী হা/৭১৫১; মুসলিম হা/১৪২; মিশকাত হা/৩৬৮৬, রাবী মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)।
১৯০. আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.), তারীখু ওমারাবনিল খাত্ত্বাব ৮৯ পৃ.।

করলাম। আর যদি দিনে ঘুমাই, তাহ'লে প্রজাদের ধ্বংস করলাম। কেননা আমি তাদের উপর দায়িত্বশীল।[১৯১]

(৩) উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) রাতের বেলা মোটা মোমবাতি জ্বেলে কর্মকর্তাদের ডেকে প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলেন। ...এমন সময় একজন বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার নিজের অবস্থা ও পরিবারের অবস্থা কেমন? তখন খলীফা ফু দিয়ে বড় মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলেন এবং গোলামকে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, চেরাগ নিয়ে আসার জন্য। কিছুক্ষণ পরে চেরাগ এল, যা নিবু নিবুভাবে জ্বলছিল।

খলীফা বললেন, তুমি এখন যা খুশী আমাকে প্রশ্ন কর। অতঃপর তিনি তার প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিলেন। শেষে ঐ ব্যক্তি তাঁকে বড় মোমবাতিটি নিভিয়ে দিয়ে চেরাগ আনার কারণ কি জিজ্ঞেস করল। জবাবে খলীফা বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! বড় মোমবাতিটি যা আমি নিভিয়ে দিয়েছি, সেটি ছিল আল্লাহ্র মাল ও মুসলমানদের মাল। তার আলোয় আমি প্রজাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই তুমি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, তখনই আমি মুসলমানদের মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলাম'।[১৯২]

(৪) আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাদী বি আমরিল্লাহ (৪৬৭-৪৮৭ হি.)-এর মন্ত্রী আবু শুজা'-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমাদের প্রতিবেশী একজন বিধবা আছেন, যার চারটি সন্তান রয়েছে। যারা নগ্ন দেহ ও ক্ষুধার্ত। কথাটি শোনার সাথে সাথে মন্ত্রী একজন লোক দিয়ে খাদ্য, বস্ত্র ও নগদ অর্থ সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর প্রচণ্ড শীতে নিজের দেহের পোষাক খুলে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এই

১৯১. তাক্বীউদ্দীন আহমাদ বিন আলী আল-মাক্বরীযী (৭৬৪-৮৪৫ হি.), আল-মাওয়া'এয ওয়াল ই'তিবার বিযিকরিল খুত্বাত্ব ওয়াল-আছার (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/৩০৮ পৃ.।

১৯২. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মিছরী (মৃ. ২১৪ হি.), 'সীরাহ ওমর বিন আব্দুল আযীয' যা ইমাম মালেক (রহঃ) ও তাঁর সাথীগণের বর্ণনার ভিত্তিতে রচিত (বৈরূত : 'আলামুল কুতুব, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ১৩৭-৩৮ পৃ.।

পোষাক পরবো না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তি আমার নিকট তাদের খবর নিয়ে আসে'। লোকটি ছুটে চলে গেল এবং দায়িত্ব পালন করে ফিরে এসে বলল যে, তারা খুবই খুশী হয়েছে এবং মন্ত্রীর জন্য দো'আ করেছে। একথা শোনার পর মন্ত্রী পোষাক পরিধান করলেন' *(আল-বিদায়াহ ১২/১৫০-৫১)*।

কি বিস্ময়কর কথা! একজন প্রজার দেহে কাপড় নেই শুনে মন্ত্রী নিজের দেহের কাপড় খুলে রেখে দিলেন। আর খবর না আসা পর্যন্ত ঐভাবেই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকলেন। এযুগে কি এর কোন তুলনা আছে? এটাই ছিল আল্লাহভীরু মন্ত্রীদের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

বয়স, যোগ্যতা ও পদমর্যাদার হিসাবে মানুষের জবাবদিহিতার তারতম্য হয়ে থাকে। সেদিকে লক্ষ্য করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মনে রেখ তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১৯৩] আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের যবান ও তাদের হাত-পা' *(নূর ২৪/২৪; ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। তাদের দেহচর্ম ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/২০-২৩)*। এমনকি পায়ের তলার মাটি তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে *(যিলযাল ৯৯/৪-৫)*। অতএব হে দায়িত্বশীলগণ! অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ'তে সাবধান হও! ক্বিয়ামতের দিন নিজের আমলনামা নিজে পাঠ করার জন্য প্রস্তুত হও! *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪)*।[১৯৪]

ইসলামী নির্বাচনের ফলাফল

(ثمرة الانتخاب الإسلامي)

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনের ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, (১) জাতি সর্বদা একদল আল্লাহভীরু, দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নেতৃত্ব নির্বাচনের অন্যায় ঝামেলা, অহেতুক অপচয় ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হ'তে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক

১৯৩. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫ রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।
১৯৪. দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী), সম্পাদকীয় ২২/২ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮।

অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে। (২) সর্বত্র একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। যা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত। ক্ষমতার লড়াই ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে মুক্ত পরিবেশে জাতি একাগ্রচিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে। (৩) সর্বোপরি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় রাজনৈতিক দল সমূহকে তাদের এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত হবে। ফলে বিদেশের অঘোষিত দাসত্ব থেকে জাতি মুক্ত থাকবে।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম

(تحقيق حقوق المواطنين والإسلام)

গণতন্ত্রে প্রধানতঃ পাঁচটি লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে। (১) ব্যক্তির বদলে জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে। (২) ১৮ বছর বয়সের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের সার্বজনীন ভোটাধিকার। (৩) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সার্বজনীন অধিকার। (৪) সার্বভৌম জাতীয় সংসদ এবং সেখানে অধিকাংশের সমর্থনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (৫) বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় মূলতঃ প্রাচীন যুগের অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উক্ত পাঁচটিকে একটি বিষয়ে পরিণত করলে দাঁড়াবে যে, ক্ষমতা একজনের হাতে নয়। বরং সমষ্টির হাতে থাকবে। আরও সংক্ষেপে বলা যায় ‘একক ক্ষমতার অবসান, সামষ্টিক ক্ষমতার উত্থান’-এটাই হ’ল গণতন্ত্রের মূল কথা।

আপাতমধুর উক্ত কথাগুলি কতটুকু বাস্তব সম্মত এবং ইসলামী নেতৃত্বের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব কি-না, এক্ষণে আমরা তা যাচাই করে দেখব।-

প্রথমতঃ জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। অথচ বাস্তবতা এই যে, কেবলমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতীত গণতন্ত্রে জনগণের আর কোন অধিকার নেই। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যক্ষ

ও পরোক্ষভাবে জনগণকে যুলুম করে, শোষণ করে ও তাদের অধিকার হরণ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী ইমারতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে আল্লাহ্র হাতে। ইমারতকে সেখানে জনগণের পবিত্র আমানত মনে করা হয়। সেকারণ আমীর ও তাঁর শূরা সদস্যগণ আল্লাহ ও জনগণ উভয়ের নিকটে জওয়াবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। 'আমীর' হন সর্বোচ্চ যিম্মাদার হিসাবে জাতির সবচেয়ে বড় 'খাদেম'।

দ্বিতীয়তঃ সার্বজনীন ভোটাধিকার। সমাজের অধিকাংশ লোকই অদূরদর্শী ও হুজুগে। সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। এদের ভোটে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। ইসলাম তাই নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ঢালাওভাবে সবার হাতে ছেড়ে দেয়নি। বরং সমাজের বিচক্ষণ আল্লাহভীরু ও যোগ্য শূরা সদস্যদের হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আর সৎ ও যোগ্য এবং আল্লাহভীরু লোকদের মাধ্যমেই কেবল জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, অন্য কোনভাবে নয়।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগার। গণতন্ত্রে সরকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যথেচ্ছ ঋণ নিয়ে দেশকে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করতে পারে। সরকারী দলের একক চিন্তাধারা অনুযায়ী পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ বা যে কোন অর্থনীতি তারা চালু করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে জাতীয় বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইমারতের পক্ষ হ'তে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। ইসলামী অর্থনীতি ব্যতীত সেখানে অন্য কোন মনগড়া অর্থনীতি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে আল্লাহ্র আইন মোতাবেক আল্লাহ্র বান্দাগণ সমভাবে বায়তুল মাল থেকে সুফল ভোগ করতে পারে।

চতুর্থতঃ জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব। কথাটি মধুর শুনালেও মূলতঃ সেখানে সরকারী দলের বা অধিকাংশ সদস্যদের বরং দলনেতার সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়। ফলে সংখ্যালঘুদের বক্তব্য সঠিক ও ন্যায্য হ'লেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব থাকে আল্লাহ্র হাতে। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আমীর তা প্রয়োগ করেন মাত্র। সেখানে সরকারী ও বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব থাকে না। বরং শূরা সদস্যদের পরামর্শের

ভিত্তিতে সবকিছু হয়। ইসলামী খেলাফতে আইন রচনার মানদণ্ড হয় 'কুরআন ও সুন্নাহ'। ফলে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বা একক ব্যক্তি, যার বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে হবে, কেবল তার বক্তব্যই গৃহীত হবে। এতে দল-মত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে।

পঞ্চমতঃ বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে এগুলি দলতন্ত্রের কাছে পরাভূত হয়। এমনকি দলের নেতাদের হুমকিতে বিচার বিভাগ পর্যন্ত শংকিত থাকে। বাক, ব্যক্তি ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা অত্যন্ত স্পষ্ট। এসবের বিগত দৃষ্টান্ত সমূহ কিংবদন্তীর মত মানব জাতির ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। তবে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কোন কথা ও কাজের স্বাধীনতা ইসলামী শাসন বিভাগ কখনোই কাউকে দিবে না *(তওবা ৯/৬৫-৬৬)*। কারণ তা হবে মানবতা ক্ষুন্নকারী ও সমাজে পশুত্ব বিস্তারে প্ররোচনা দানকারী। সাথে সাথে তা হবে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী।

অতএব বলা চলে যে, রাজতন্ত্রের উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে গণতন্ত্র এনে রাজতন্ত্রের ভাল বিষয়গুলি যেমন দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে যেভাবে জন অধিকারকে ভূলণ্ঠিত করা হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি গণতন্ত্রের ফাঁদে ফেলে দলতন্ত্রের চোরাবালিতে গণ অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ইসলাম রাজতন্ত্রের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনস্ত করে রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরকে স্বেচ্ছাচারিতা হ'তে বিরত রেখেছে। সাথে সাথে জনগণের খাদেম হিসাবে তার উপর সর্বোচ্চ যিম্মাদারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। ফলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও রাজার ন্যায় 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। একদিকে আল্লাহ অন্যদিকে মজলিসে শূরার নিকটে তিনি সর্বদা দায়বদ্ধ থাকেন। সর্বোপরি স্বাধীন ইসলামী আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে যৌক্তিক অভিযোগের দুয়ার যেকোন নাগরিকের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। তাই ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থায় আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা ও তদনুযায়ী দেশ ও সমাজ পরিচালনাই মুখ্য হয়ে থাকে। আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালে জান্নাত লাভ।

উপসংহার (الخاتمة)

সূরা নিসা ৫৮, ৫৯ ও ৬০ তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের নির্দেশ হ'ল, আমানত সমূহ যথাস্থানে সমর্পণ কর। এজন্য যোগ্য নেতার কাছে দায়িত্বের আমানত সমর্পণের নিয়ম-পদ্ধতি আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন চরিত থেকে পেশ করেছি। ৫৯ আয়াতে আমীরের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠনে 'আমীর' (নেতা) ও 'মামূর' (কর্মী) এ দু'টি স্তর ব্যতীত মধ্যবর্তী কোন স্তর নেই। আমীরের অধীনে সকল মামূরের অধিকার সমান। একইভাবে সকল স্তরের মামূরের কাছে আমীরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে সবার উপরে। সমাজের সর্বত্র এইরূপ ভক্তি ও আনুগত্যের আবহ সৃষ্টি হ'লে সেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরী হবে। ফলে হিংসা ও হানাহানি থেকে সমাজ মুক্ত থাকবে এবং সামাজিক ঐক্য ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

আমীরের আনুগত্যে অনেক সময় দুনিয়া হারালেও আখেরাত অবশ্যম্ভাবী। এই নিঃস্বার্থ ও পরকালীন প্রেরণার বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে কেবল ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। অন্য কোন সংগঠনে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা কল্পনা করা যায় না।

৬০ আয়াতে বিবাদীয় বিষয় সমূহকে ত্বাগূতের কাছে নিয়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর বিধানের বাস্তবায়ন থাকবে। একেই বলে 'তাওহীদে ইবাদত' যা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

আয়াতের শেষাংশে 'শয়তান' বলতে মানবরূপী শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকে। এদের ভিতর ও বাহির এক নয়। দ্বীনদার মুমিনদের এদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যদিও দুনিয়াদাররা সর্বদা এদের দিকেই যেতে চাইবে। সরল-সিধা সাধারণ মানুষকে প্রতারণায় ভুলিয়ে এই ধরনের দুষ্টু লোকেরাই আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই বর্তমান কালের এই নোংরা নির্বাচন ব্যবস্থার অভিশাপে বিপর্যস্ত সমাজকে বাঁচাতে হ'লে অবিলম্বে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা কায়েম করা যরূরী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন : এক নযরে

(انتخاب الامارة في الإسلام : في لمحة)

রাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত খলীফা বা আমীর থাকবেন। তাঁর একটি মনোনীত ‘মজলিসে শূরা’ থাকবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রের অন্যান্য গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা উক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। এম.পি নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবে না। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধী দল বলে কিছু থাকবে না। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সংগঠন সমূহ থাকবে। সৃষ্টির সেবা, প্রশাসনকে দিক-নির্দেশনা দান এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হবে সকল সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ কেবল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। যুগে যুগে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হ’লেও মানব চরিত্রের কোন পরিবর্তন নেই। সেকারণ ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহ অপরিবর্তনীয়। অতএব মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সত্য বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তা যতই আপাতমধুর হৌক না কেন, মুমিন তা কখনোই মেনে নিতে পারে না। আল্লাহ আমাদের সত্য অনুসরণের তাওফীক দান করুন- আমীন!

জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব সমূহ

(إقتراحات في وحدة الأمة)

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। ‘হাবলুল্লাহ’ তথা কুরআন ও সুন্নাহকে মযবুতভাবে ধারণ করে জামা‘আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা ইসলামের মৌলিক নির্দেশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। কিন্তু নানা কারণে সকল মুসলমান এক জামা‘আতভুক্ত নয় বা হ’তে পারে না। যদি কারণগুলি পরস্পরে বিদ্বেষমূলক ও শত্রুতামূলক হয় এবং ইসলামী আদর্শের বাইরে বিজাতীয় কোন মতাদর্শের বাস্তবায়ন লক্ষ্য হয়, তাহ’লে ঐসব দল ও সংগঠন জাহেলিয়াতের সংগঠন হবে এবং ঐসবের অন্তর্ভুক্ত সকলে আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে। হাদীছে এদেরকে ‘জাহান্নামীদের দলভুক্ত’ বলা হয়েছে। যদিও এরা ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, তারা মুসলিম’।[১৯৫]

আর যদি কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সে আলোকে সমাজ সংস্কার হয়, তাহ’লে তা হবে সত্যিকারের ইসলামী সংগঠন। তার সংখ্যা একাধিক হ’লেও তা দোষের হবে না। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এইসব সংগঠন দ্রুত একত্রিত হ’তে পারে এবং যেকোন ইসলামী বিষয়ে দ্রুত পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে উপনীত হ’তে পারে’।[১৯৬]

উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপ :

(১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ও নেতৃবৃন্দকে যদি বুঝানো যায় যে, আল্লাহ্র বিধান মেনে নেওয়ার মধ্যেই দুনিয়াবী কল্যাণ বেশী, তাহ’লে তারা আশা করি অন্ততঃ দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে নিবেন। যেমন সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাস ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ্র

---

১৯৫. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮, রাবী হারেছ আল-আশ‘আরী (রাঃ)।

১৯৬. সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ১৩/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯; ‘জীবন দর্শন’ বই শিরোনাম ‘ঐক্য দর্শন’ ৪৭ পৃ.।

বিধানের স্থায়ী কল্যাণকারিতা এবং মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের মর্মান্তিক আযাবের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

এভাবে অন্ততঃ সামাজিক শৃংখলা ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল ধর্ম-বর্ণ ও দল-মতের লোকদের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি হবে। যদি দেড় হাযার বছর পূর্বে মদীনার ইহূদী-নাছারা ও পৌত্তলিকগণ স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ না করেও ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধান সমূহ মেনে নিতে পারে, তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে কেন তা মেনে নিতে পারবেন না?

(২) বাকী রইল ইসলামী নেতাদের মাঝে ঐক্য। এটি খুবই সহজ এজন্য যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করলে ইসলামের নামে এক প্লাটফরমে সহজেই আসতে পারেন ও যেকোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে এটা খুবই কঠিন কতগুলি কারণে, যেমন এঁরা ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান ‘হানাফী’ মাযহাবের হ’লেও তাদের মধ্যে রয়েছে পরস্পরে বিস্তর ধর্মীয় মতভেদ।

তাছাড়া ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে এদেশে রয়েছে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর। নিঃসন্দেহে এক পীরের সাথে আরেক পীরের মিল নেই। মিল নেই একে অপরের মুরীদদের সাথেও। এরা সবাই ভারতের উত্তর প্রদেশের **(ক)** আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী (১৮৫৬-১৯২১)-এর অনুসারী। যারা ছূফীবাদে বিশ্বাসী ও কবরপূজারী। এরা একাধিক রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। এদের বাইরে রয়েছে **(খ)** মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ‘লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯)-এর অনুসারী ‘জামায়াতে ইসলামী’ (প্রতিষ্ঠা : ১৯৪১ সালের ২৬শে আগস্ট)। এদের নিকট রাজনীতিই মুখ্য। এরা সমসাময়িক রাজনীতির আলোকে দ্বীনকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। **(গ)** মাওলানা ইলিয়াস দেউবন্দী (১৮৮৫-১৯৪৪ খৃ.)-এর অনুসারী ‘তাবলীগ জামাত’ (সূচনা : ১৯২০ খৃ.)। এরা মূলতঃ ছূফীবাদে বিশ্বাসী। যারা ২০১৫ সালের নভেম্বরে সা‘দপন্থী ও তার বিরোধী দু’ভাগ হয়ে গেছেন। **(ঘ)** ২০১০ সালের ১৯শে জানুয়ারী গঠিত হয়েছে দেউবন্দী ঘরানার কওমী মাদ্রাসা সমূহের সংগঠন ‘হেফাজতে ইসলাম’ (প্রতিষ্ঠাতা আমীর : শাহ আহমাদ শফী (১৯১৬-

২০২০ খৃ. হাটহাজারী)। এরাও ২০২১ সালের ২৬শে এপ্রিল বিভক্ত হয়ে গেল। দলটি আমলের দিক দিয়ে হানাফী, আক্বীদার দিক দিয়ে মাতুরীদী এবং তরীকার দিক দিয়ে দেউবন্দী।

উপরের দলগুলির মধ্যে পরস্পরে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তবুও এদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলি আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।...

সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে, ঐক্যের ভিত্তি হ'ল মহৎ উদ্দেশ্য, বিনয় ও সহনশীলতা। যেটা সাধারণতঃ হকপন্থী সমমনাদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যার দ্বারা 'হক' শক্তিশালী হয়। উক্ত লক্ষ্যে সকল ইসলামী দল নিম্নোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে।

(১) সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে। কেননা চার ইমামের সকলের স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল এই যে, 'কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পেলে জেনে রেখ, সেটাই আমাদের মাযহাব' *(শা'রানী, আল-মীযানুল কুবরা ১/৭৩ পৃ.)*। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের শিষ্যদের কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন *(ঐ ১/৬০)*। আহলেহাদীছগণের দাবীও সেটাই। অতএব এক্ষেত্রে হানাফী-আহলেহাদীছ সকলে এক প্লাটফরমে আসতে পারেন। এরপরেও ব্যাখ্যাগত মতভেদ যদি থাকে এবং সেটা যদি ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করার পর্যায়ে না যায়, তবে সেক্ষেত্রে স্ব স্ব আমল পৃথক রেখেই পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। (২) যদি সকলে স্ব স্ব দলীয় প্যাড ও ব্যানার অক্ষুণ্ন রাখতে চান, তবুও পারস্পরিক ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্লাটফরম সৃষ্টি করা খুবই সহজ। আমরা মনে করি বাংলাদেশে এটা এখন সময়ের দাবী। জনগণের প্রাণের দাবীও এটা।

উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যরূরী বিষয়গুলি হ'ল : (১) পারস্পরিক গীবত-তোহমত ও অশালীন বক্তব্য সমূহ পরিহার করা। বিশেষ করে বই ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থায়ী গীবত বর্জন করা। কেননা এগুলির গোনাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে এবং গীবতকারী ব্যক্তির ও সমষ্টির আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হবে (২) নিজ মতের উপরে এবং

অনৈক্যের উপরে যিদ না করা এবং সংশোধনকামী হওয়া (৩) দুনিয়াবী স্বার্থের উপরে আখেরাতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া (৪) সর্বোপরি মুসলিম ঐক্য ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার নেকী অর্জনের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প থাকা এবং উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা। আমরা মনে করি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক Consensus বা 'জাতীয় ঐক্যমত' সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১৯৭]

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلآ أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

১৯৭. সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ৬/১১ সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩; দিগদর্শন ১/১৫৪ পৃ.; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রচারপত্র-১০ 'ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম'।

آب زمزم خوردہ بودم اُب سُورَی کئے خورم

پادشاہی کردہ بودم پاسبانی کئے کنم

যমযম পান করতাম মোরা, শরাব পান কেমনে করি

বাদশাহী করতাম মোরা, দারোয়ানী কেমনে করি?

وہ زمانے میں معزّز تھے مسلماں ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

যুগে যুগে তারা সম্মানিত ছিল মুসলমান হয়ে

আর লাঞ্ছিত হয়েছ তোমরা কুরআন ত্যাগী হয়ে।

(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)

کی محمدؐ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

মুহাম্মাদের প্রতি অনুগত হ'লে, আমরা সবাই সাথী তোমার

এ পৃথিবী কোন বিষয় নয়, লওহ ও কলম সবই তোমার।

(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২৫০/=। ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৭ম সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ৩য় প্রকাশ (৬০/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম, ২য় সংস্করণ (৭০/=)। **৫৫.** তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)। **৫৬.** মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৫৭.** আল্লাহকে দর্শন (২৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৪র্থ প্রকাশ (১৫/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৪০/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। **১২.** তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। **৩.** এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। **৪.** ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ১. ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান (৩৫/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩৫/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/= **৬.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৭.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৭তম বর্ষ) ৮০/=। **৮.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৯.** মাসনূন দো'আ ও যিকর (পকেট সাইজ) ৩০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।

হা.ফা.বা. শিক্ষাবোর্ড-এর জন্য প্রণীত বই সমূহ : (শিশু শ্রেণীর জন্য) ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)। **৪.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **৫.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **(১ম শ্রেণীর জন্য) ৬.** সহজ আরবী (৩৫/=)। **৭.** সহজ বাংলা (৩৫/=)। **৮.** সহজ ইংরেজী (৪০/=)। **৯.** সহজ গণিত (৩৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **(অন্যান্য) ১২.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৩.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৫.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৬.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৭.** সোনামণিদের মাসনূন দো'আ শিক্ষা (৪৫/=)।